শুকতারা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ • ১৩৮০

রহস্যময় অভিযাত্রী

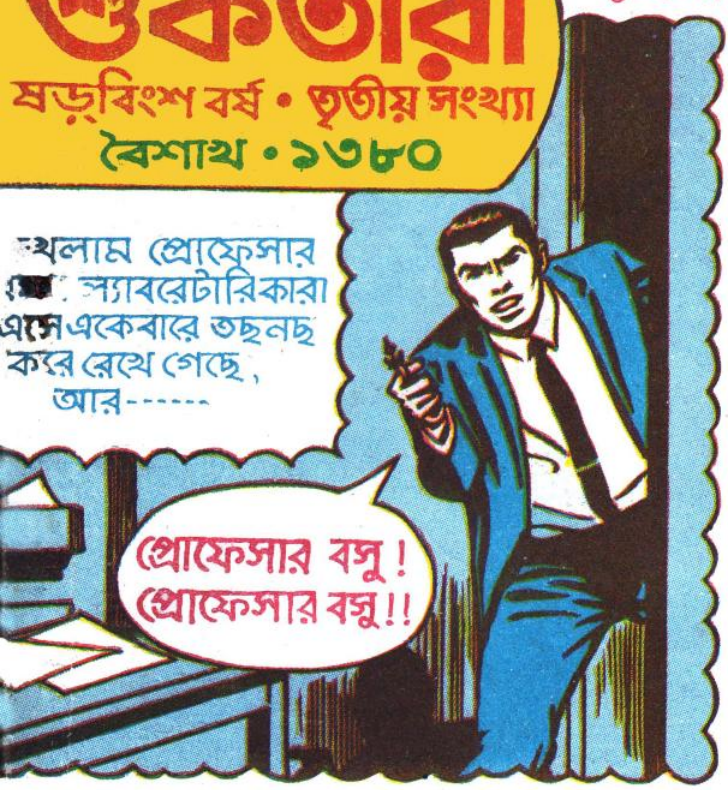

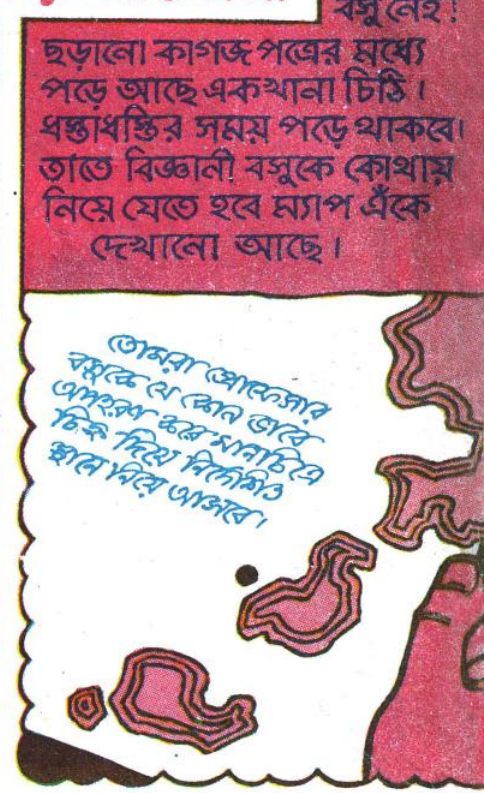

মনে হয় শত্রুভাবাপন্ন কোন রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রোফেসারকে অপহরণ করেছে। ভারত সরকারের জরুরী নির্দেশে আমাকে বেরোতে হলো প্রোফেসারকে খুঁজে বের করতে। প্রথমে স্থলপথে মোটরে তারপরে জলপথে মোটর বোটে, ম্যাপে চিহ্নিত দ্বীপের কাছে এলাম----

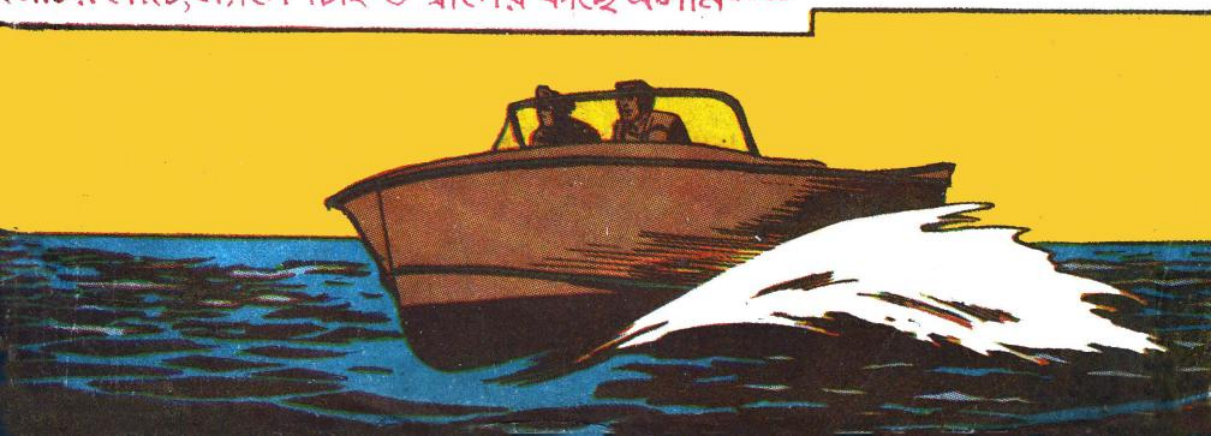

ষড়যন্ত্র। দুর্যোধন শকুনি মামার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠিয়ে দেবেন। মতলব—সেখানে তাঁদের পুড়িয়ে মারা।

ধৃতরাষ্ট্রের কথামত পাণ্ডবেরা চলে গেলেন সেখানে। তাঁদের জন্য পুরোচন তৈরী করে রেখেছে জতুগৃহ, নিমেষে পুড়ে যায় এমন ঘর। কিন্তু বিদুর সবই জানিয়ে দিয়েছিলেন গোপনে, পরদেশী ভাষায়। শিখিয়ে দিয়েছিলেন বাঁচার কৌশলও।

অমৃত সমান
মহাভারত-কথা
বোরোলীন
হাউস কর্তৃক প্রচারিত

ঘরে আগুন লাগল বটে, কিন্তু পাণ্ডবেরা তৈরীই ছিলেন। তাঁরা পালিয়ে গেলেন সুড়ঙ্গপথে। পুড়ে মরল পুরোচন, আর অন্যরা। মহাবলী ভীম মা আর নকুল সহদেবকে একাই বয়ে নিয়ে চললেন বনপথে। আগে যুধিষ্ঠির। ওঁরা মুক্ত।

বোরোলীন
সুরভিত
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক,
কিংবা ঝলসানো ত্বকের
অনবদ্য নিরাময়—।

(চলবে)

বাঁটুল দি গ্রেট

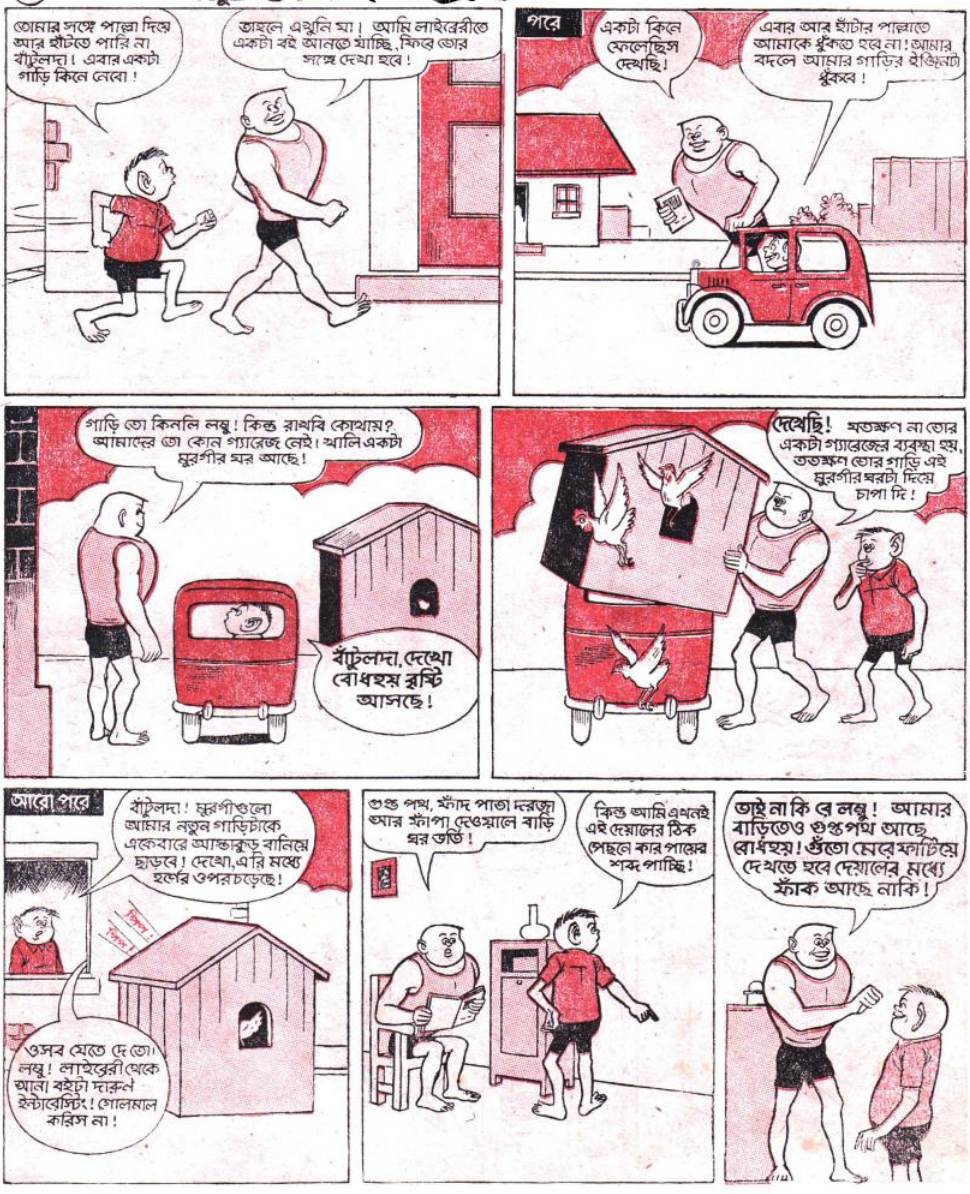
তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর হাঁটতে পারি না, বাঁটুলদা। এবার একটা গাড়ি কিনে নেবো!
তাহলে এখুনি যা। আমি লাইব্রেরীতে একটা বই আনতে যাচ্ছি, ফিরে তোর সঙ্গে দেখা হবে!
পরে
একটা কিনে ফেলেছিস দেখছি!
এবার আর হাঁটার পাল্লাতে আমাকে ধুঁকতে হবে না! আমার বদলে আমার গাড়ির ইঞ্জিনটা ধুঁকবে!
গাড়ি তো কিনলি লম্বু! কিন্তু রাখবি কোথায়? আমাদের তো কোন গ্যারেজ নেই। খালি একটা মুরগীর ঘর আছে!
বাঁটুলদা, দেখো বোধহয় বৃষ্টি আসছে!
দেখেছি! যতক্ষণ না তোর একটা গ্যারেজের ব্যবস্থা হয়, ততক্ষণ তোর গাড়ি এই মুরগীর ঘরটা দিয়ে চাপা দি!
আরো পরে
বাঁটুলদা! মুরগীগুলো আমার নতুন গাড়িটাকে একেবারে অ্যান্ডারকুড় বানিয়ে ছাড়বে! দেখো, এরি মধ্যে হর্ণের ওপর চড়েছে!
ওসব যেতে দে তো! লম্বু! লাইব্রেরী থেকে আনা বইটা দারুণ ইন্টারেস্টিং! গোলমাল করিস না!
গুপ্ত পথ, ফাঁদ পাতা দরজা আর ফাঁপা দেওয়ালে বাড়ি ঘর ভর্তি!
কিন্তু আমি এখনই এই দেয়ালের ঠিক পেছনে কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি!
তাই নাকি রে লম্বু! আমার বাড়িতেও গুপ্ত পথ আছে, বোধহয়! শুঁতো মেরে ফাটিয়ে দেখতে হবে দেয়ালের মধ্যে ফাঁক আছে নাকি!

যখন দেয়ালে টোকা দেবো তখন শোন!
বাঁটুলদা থামো! ও ইঁদুরের পায়ের শব্দ!
ওঃ দেরী হয়ে গেছে! দেখো বাঁটুলদা! তুমি গুঁতো মেরে দেয়ালে গর্ত করে ফেলেছো! আর দেখো এটা বাগানের দিক!
কি যাচ্ছেতাই দেয়াল রে! টোকাতেই ভেঙে গেলো!
তোমার গুঁতোয় দেয়ালের ইঁট ছিটকে গিয়ে মুরগীর ঘর ভেঙে জল পড়ে আমার গাড়ির বারোটা বেজে গেলো!
ঘাবড়াস না লম্বু! এই ফোঁকোর দিয়ে তোর গাড়িটা ঘরে ঢুকিয়ে দি তাহলে আর ভিজবে না!
সবই তো হলো বাঁটুলদা! কিন্তু দেখো, ঘরের ভেতরেও জল যাচ্ছে!
হুম্! মুরগীগুলোও ভিজছে!
আয় এই মুরগীর ঘরটাকে ঠেলে গর্তের মুখটা বন্ধ করে দি। তাহলে দেখবি সবদিকেই কেমন সুন্দর ঠিক হয়ে যাবে!
যাক, এ ব্যবস্থায় সবাই খুশী! এবার নিশ্চিন্তে বইটা শেষ করি!
কোকোর কোঁওওও!
ফররররফোং!
নং

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৮০

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	রহস্যময় অভিযাত্রী ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রথম ছবি
৩।	মেয়ের বিয়ে (কবিতা) ...	শ্রীঅসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৩
৪।	তেতলার লাল কামরা (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	১৫৮
৫।	বিক্রমাঙ্ক ত্রিভুবনমল্ল (অমর বীর কাহিনী) ...	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	১৬৯
৬।	বন্ধু একেই বলে (জীবন কথা) ...	অরুণ দে ...	১৭৯
৭।	আবিষ্কার ঃ এত নুন দিচ্ছে কে (জানবার কথা)	— ...	১৮১
৮।	বোকা হীরু (ছবিতে গল্প) ...	মৈত্রেয়ী মুখার্জী ...	১৮২
৯।	অনন্ত লক্ষ্মণ কাহ্নেরি (শহীদ স্মৃতিকথা) ...	রঞ্জন মিত্র ...	১৮৮
১০।	ছবিতে কি ভুল আছে বল তো ? (মজার ছবি)	— ...	১৯৩
১১।	জাবালজা ও টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ...	১৯৪
১২।	১৯৩ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর ...	— ...	২০১
১৩।	ফকিকের মাদুলি (সত্যঘটনা)	সুশীল দাশগুপ্ত ...	২০২
১৪।	হাঁদা-ভোঁদার জ্ঞানদান (ছবিতে গল্প) ...	— ...	২০৬
১৫।	সোনার ঘণ্টা (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	অনিল ভৌমিক ...	২০৮
১৬।	ইণ্টারভিউ (গল্প) ...	জীবন ভৌমিক ...	২১৯
১৭।	সাপ খেকো ব্যাঙ ...	বগলা যোগশর্মা ...	২২১
১৮।	"৺সুব্রত দাশগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)	...	২২২
১৯।	পারানা (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	শ্রীআনন্দকুমার বসু ...	২২৩
২০।	নবাবের ভ্রাতৃস্নেহ (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	শ্রীরেবতীকান্ত গোস্বামী ...	২২৬
২১।	বরাত ঃ গবেষণা চলছে (জানবার কথা) ...	— ...	২২৮
২২।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	২২৯

এ. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৮০ পয়সা

everest/551b/PP bn

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা : ১৩৮০, বৈশাখ

মেয়ের বিয়ে

শ্রীঅসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খুকুমণির পুতুলমেয়ে আজ সেজেছে বিয়ের সাজে !
রাংতা দিয়ে তৈরী মাইক সত্যি হয়ে তাইতো বাজে !!
খুকুমণি ব্যস্ত বড় তাই পরেছে পেঁচিয়ে শাড়ি
আজ সন্ধ্যায় আসবে জামাই টোপর পরে,
হাঁকিয়ে গাড়ি !!
সাতটা পুতুল দিন রাত্তির ভিয়েন ঘরে করছে কাজ !
খুকুমণির ছোট্ট মেয়ের আজকে বিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ আজ ॥
রইল সবার নেমন্তন্ন সবাই এসো খুকুর বাড়ি
খুকুর মেয়ের আজকে বিয়ে কালকে যাবে শ্বশুরবাড়ি ॥

বিদেশী গল্প

তেতলার লাল কামরা

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

সে-স্বপ্ন তিনবার দেখেছি জীবনে।

প্রথমবার যখন দেখি, বয়স আমার আট বছর মাত্র। মা-বাবার সঙ্গে বসে ডিনার খাওয়ার অধিকার তখনও পাই নি। আমাদের নিজের ঘরেই খাবার আসে দিনে চারবার, আয়া সিমসন সামনে বসে খাইয়ে দেয়। ছিমছাম মানুষটি মিসেস সিমসন, আমাদেরও রাখে ছিমছাম পরিচ্ছন্ন করে। শিক্ষয়িত্রী আছেন একজন, তিন দফায় ছয় ঘণ্টা তিনি পড়ান আমাদের এই তিন ভাইবোনকে। দিনের বাকী আঠারো ঘণ্টা আমরা থাকি আয়া সিমসনের হেফাজতে।

যত্ন ও বেশ করে। ওদিক দিয়ে খুঁত ধরবার উপায় নেই। আমাদের তো নেই-ই, অমন যে খুঁতখুঁতে মা আমাদের, তাঁরও না। "এটা করলে না কেন মার্থা?"—এ অনুযোগ তাঁর জিভের ডগায় এসেও গলার ভিতর ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে অনেক সময়, বলবার আগেই মা দেখতে পেয়েছেন যে সেই কাজটিই মার্থা এইমাত্র সমাধা করে এল, বা এখনও করছে বসে বসে।

গল্প ফেঁদেছিলাম একটা স্বপ্নের কথা দিয়ে। এসে পড়লাম আয়া সিমসনের কথায়। তাতে কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন যে গুছিয়ে গল্প বলার বিদ্যে আমার নেই।

অনেকেরই থাকে না তা, এটা ঠিক। কিন্তু আমি যে সে-দলের নই, তা এক্ষুনি বুঝতে পারবেন সবাই।

বলছিলাম—মিসেস সিমসন খাওয়ার সময় বসে থাকে আমাদের সামনে। আমার প্লেটে পুডিং একটু বেশীই তুলে দেয়, জানে যে ও-জিনিসটা আমার খুব প্রিয়। ছয় বছরের বোন আগাথার স্যাণ্ডউইচগুলো কুচিয়ে কুচিয়ে করে দেয় ঐ সিমসনই, নিজে কেটে নেওয়ার ক্ষমতা এখনও আগাথার হয় নি। বাকী রইল দশ বছরের দিদি এথেনা। এতক্ষণ তার কথা বাকী রেখেছি শুধু এই কারণে যে আয়া সিমসনকে সে মোটেই আস্কারা দিতে রাজী নয়। "তুমি থামো তো মার্থা," বলে কথায় কথায় সে ধমকে ওঠে বেচারী আয়াকে।

যা হোক, ডিনারের এক ঘণ্টা পরেই আমরা শুয়ে পড়ি। আর শোবার আগের এই এক ঘণ্টা গল্প শুনি সিমসনের কাছে। আগাথা আর আমি তো গিলি ওর গল্পগুলি, এমন যে এথেনা কোন ব্যাপারেই যে আমল দেয় না আয়াকে, সেও গল্প শোনার বেলায় মার্থা সিমসনের একান্ত অনুগত বনে যায়।

হ্যাঁ, স্বপ্নের কথাটা তাহলে বলি এবার।

সেদিন মার্থা সিমসন এক অচিনদেশের রাজপুত্তুরের গল্প বলছিল। রাজপুত্তুর নানা দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। দুধের মত সাদা তার ঘোড়া, রক্তের মত লাল এক গোছা পালক তার মাথার মুকুটে দুলছে হেলছে উড়ছে হাওয়ায়। কোমরে ইয়া লম্বা তরোয়াল, হাতে ইয়া-লম্বা বল্লম। চলেছে রাজপুত্তুর টগবগ টগবগ—

সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে সে এক কেল্লায় অতিথি হল। বনের ধারে পুরোনো কেল্লা, লোকজন তাতে কম। কেল্লাদারের সঙ্গে রাজপুত্তুরের দেখা হল না, সে নাকি যুদ্ধে গিয়েছে কোথায়। অতিথির আদরযত্ন যা করবার, সব কিছুই করল কেল্লাদারের স্ত্রী। খাওয়া-দাওয়া, গল্পসল্প, সব-শেষে কেল্লার বুড়ো চারণের ভাঙ্গা গলায় বীর রসাশ্রিত গান। তাও যখন সাঙ্গ হল, দুর্গস্বামিনী একটা দাসীকে ডেকে বললেন—"একটা আলো দেখিয়ে রাজপুত্তুরকে তুমি শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসো। তেতলার লাল কামরায় ওঁর জন্য বিছানা করা হয়েছে।"

দাসী আগে আগে চলেছে মোমবাতি হাতে নিয়ে। সিঁড়িতে হাওয়ার বেশ দাপট, আলোটা কাঁপছে, দপদপ করছে, নিবেও যেতে চাইছে এক একবার। দুধারে এবড়ো খেবড়ো দেয়ালে নানারকম ছায়ার ভূত-নাচন, তারই মধ্যে সিঁড়ির ধাপে ধাপে খটখট শব্দ উঠছে রাজপুত্তুরের লোহা-বাঁধানো জুতোর। অনেক অনেক ধাপ সিঁড়ি—রাজপুত্তুর উঠেই চলেছেন—উঠেই চলেছেন—

মার্থা সিমসনের গল্পের এই পর্যন্তই শুনতে পেয়েছিলাম আমি। শেষ পর্যন্ত সে-গল্প

কেমন দাঁড়িয়েছিল, আদৌ শেষ হয়েছিল কিনা গল্পটা, কিছুই জানতে পারি নি। কারণ আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঐ গল্পটাই স্বপ্ন দেখেছিলাম সে রাত্রে। সেই হল প্রথমবার।

ঐ গল্পটাই। তবে হুবহু ও-রকম নয়। রাজপুত্রটা আর রাজপুত্র থাকে নি স্বপ্নে। সেটা পরিণত হয়েছে জোসেফ রেমিংটন নামক এক অষ্টমবর্ষীয় বালকে। যার বড় বোনের নাম এথেনা আর ছোট বোনের নাম আগাথা। আরও কিছু অদল-বদল হয়েছে বই কি! সে সব ক্রমশঃ বলছি।

স্বপ্ন দেখলাম যেন আমি জোসেফ রেমিংটন বেড়াতে বেরিয়েছি সুটকেস হাতে নিয়ে। সাদা ঘোড়ায় আমি সওয়ার হই নি। অমনি বাসে চেপে পেরিয়ে যাচ্ছি শহর গ্রাম পাহাড় প্রান্তর। মাথায় লাল পালক নেই, আমার এ পশমী ক্যাপ-এ লাল পালক মানাবে না বলেই পরি নি বোধ হয়।

বয়স? বাসে চেপে চলতে চলতে সন্দেহ হচ্ছে—দেহের বয়স আমার এই আট বছরই রয়ে গিয়েছে, তা নইলে গার্ড আমাকে মাস্টার মাস্টার করবে কেন বারবার? মাস্টার তো ছোট ছেলেদেরই বলা হয়! তা সে যাক, বাইরে থেকে আট বছরের খোকা বলে লোকে ভাবে যদি আমাকে, তার আমি করছিই বা কী, আর তাতে আমার এলো-গেলোই বা কী। মনে মনে আমি ঠিক জানছি, ঘোড়ায় চড়ে সেই রাজপুত্তুর দুনিয়া চক্কোর দেবার জন্য বেরিয়েছিল যে বয়সে, আজ আমার বয়স তার থেকে একটা দিনও কম নয়।

বল্লম তলোয়ার নেই, বলছ? নেই—তাতে হয়েছে কী? ওসব আজকাল কোন্ কর্মেই বা লাগে? আগেকার দিনে দৈত্যদানো থাকত দেশে, রাজকন্যাদের ধরে ধরে নিয়ে যেত, উদ্ধার করবার জন্য রাজপুত্তুরদের তরোয়াল-বল্লম রাখতেই হতো সঙ্গে। আজ কি দৈত্য-দানো আছে নাকি কোথাও? ঝাড়ে-বংশে নিপাত হয়েছে ওরা। যদিই কেউ কোথাও থেকে থাকে ঘাপটি মেরে, খবর পাওয়ামাত্র থানায় ফোন করে দাও। তরোয়াল-বল্লম তো সামান্য কথা! কামান-বন্দুকও যদি দরকার হয়, তাই নিয়ে ছুটবে পুলিস দৈত্যদের দৈত্যগিরি ঠাণ্ডা করে দেবার জন্য।

অতএব আমি চলেছি—গল্পের রাজপুত্তুরের সমান-বয়সী তরুণ জোসেফ রেমিংটন। আট বছরের একটা দুগ্ধপোষ্য বালকের ছদ্মবেশে, সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে, পশমী ক্যাপ মাথায়, চলেছি দুনিয়াটা এক চক্কোর ঘুরে আসবার জন্য। অমনিবাস থেকে নেমে কখন পায়ে হাঁটতে শুরু করেছি, পীচ-বাঁধানো চওড়া রাজপথ থেকে নেমে কখন মেঠো পথ ধরে ধরে অস্ত-সূর্যের লাল দরজার কাছ বরাবর এসে পড়েছি, খেয়ালই করি নি কিছু।

খেয়াল হলো সমুখে মস্ত-বড় এক ভাঙ্গা বাড়ি দেখে।

না, গল্পের সে কেল্লা নয়, এটা একটা আটপৌরে বাড়ি, যেমন বাড়ি আমাদের লণ্ডন শহরেও হাজার হাজার দেখা যায়। তফাৎ শুধু এই যে বাড়িটা বিলকুল ভাঙ্গা, অমন ভাঙ্গা বাড়ি লণ্ডনে দেখলে সরকারী লোকেরা তক্ষুনি দৌড়ে আসবে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্য।

তফাৎ আরও আছে। এর চারদিকে এমন ঘন বন—

না, চারদিকেই বন নয়, বলা যেতে পারে—সাড়ে তিন দিকে বন। একটা কোণ ফাঁকা ছিল বলেই আমি এ-বাড়ির সামনে এসে পড়তে পেরেছি।

হ্যাঁ, সাড়ে তিন দিকে বন, এমন ঘন বন যে এই ভর সন্ধ্যেবেলায় তার ভিতরে ঢুকে পড়তে মনটা যেন চাইছেই না আমার। বারে বারে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি ভাঙা বাড়িটার দিকে। সারাদিনের পর্যটনে দেহটা ক্লান্ত হয়েছে বই কী, আটবছরের শিশুরই দেহ তো! তার উপরে আর কত ধকল সইবে? ও-বাড়িতে রাতটা কাটালে দোষ কী? বন থেকে অবিশ্যি হরিণ মারে ও-বাড়ির লোকেরা, এক প্লেট মৃগমাংস উদরস্থ করে রাত্রিটা ওখানে ঘুমিয়ে নেওয়া যায় যদি, কোন পর্যটক রাজপুত্র সেটাকে প্রথাবিরুদ্ধ বলতে পারবে না।

একটা কথা আপনারা ভাল করে বুঝুন। ক্ষিধেই পাক, আর রাত্তিরই আসুক, ও-বাড়িতে আমি যেচে অতিথি হতে যেতাম না কদাচ, যদি-না আমার সমুখে বেধে যেত ঐ অজগর অরণ্য। পথে যখন বেরিয়েছি, তখন পথই সম্বল। রাত যখন হবে, ঘুম যখন পাবে, স্যুটকেসটি মাথায় দিয়ে পথেই শুয়ে পড়ব, এ না হলে আর অ্যাডভেঞ্চার কী? এ-বাড়িতে ঢুকে পড়বার কথা যে মনে হচ্ছিল, সে শুধু সমুখে পথ আর ছিল না বলেই। বন! বন! আর বন! ওর মধ্যে চলার-মত পথ পাব কোথায়?

অগত্যা আমি ভাঙ্গাবাড়ির মরচে-ধরা কড়া ধরে জোরে জোরে নাড়া দিলাম কয়েক বার। কড়াতে মরচে দেখেই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে আসছিল, এ-বাড়িতে কী লোক আছে? বাইরের পৃথিবী থেকে লোক আসে কি এখানে কোনদিন? আসত যদি, কড়ায় তাদের হাত পড়ত যদি, এত মরচে কি কখনো জমতে পারত ওতে?

যা হোক, ভাবনা অকারণ। দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল। আর আমি চমকে উঠলাম। দরজা যে খুলেছে, সে আর কেউ নয়, আমার আয়া মার্থা সিমসন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! মার্থাকে এমন বুড়ো দেখাচ্ছে কেন?

আর তার চেয়েও আরও বেশী আশ্চর্য, মার্থা সিমসন, আমাদের এত দিনকার পুরোনো আয়া মিসেস সিমসন চিনতেই পারছে না আমাকে।

চিনতে সে পারল না দেখে খুই রেগে গিয়েছিলাম আমি। হয়তো তাকে,

অভদ্র, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি বলে, যাচ্ছেতাই অপমান করে আমি চলেই আসতাম সে-বাড়ির সম্মুখ থেকে, কিন্তু সেটা পেরে উঠলাম না, রাত্রি একেবারে আসন্ন বলে।

আগে আগে মিসেস সিমসন, আমি তার পিছনে। কথা সেও কইছে না, আমিও সুযোগ পাচ্ছি না কইবার। ভাবছি, সুযোগ পাবই একসময়। কোথাও থিতু হয়ে বসতে পারলেই পাব! না বসতে দিয়ে তো পারবে না আর!

এ-রকম পুরোনো বাড়িতে যেমন হয়, ভিতরে ঢুকেই বিশাল হল ঘর। তার চার দেয়ালেই অগুন্তি দরজা। এক এক দরজা দিয়ে এক এক মহলে যাওয়ার পথ। আমি চট্ করে গুনে ফেলেছি—দরজার সংখ্যা দশটা। এক এক মহলে যদি তিন চারখানা করেও ঘর থাকে কম-সে কম, এ-বাড়ির নীচের তলাতেই ত্রিশ চল্লিশখানা ঘর রয়েছে। তারও উপরে রয়েছে দোতলা, তেতলা। উঃ, কত ঘর! কত ঘর! একটা পলটন বাস করত নিশ্চয় এখানে।

ঐ দশটা দরজারই ভিতরে একটা পেরিয়ে গেলাম আমরা—আগে আগে সিমসন, তার পিছনে আমি। একখানা ঘরে এলাম। তার কোণ দিয়ে সরু সিঁড়ি—উঠে গিয়েছে উপরে। আর তার মাঝখানে খাবারের টেবিল। টেবিলটা দশ বারো জন বসবার মত, কিন্তু খাওয়ার লোক তো আমি একাই দেখছি।

টেবিলের দিকেই চোখ ছিল, সেটা সিমসনের দিকে ফেরাতে গিয়েই অবাক্। কোথায় সিমসন? না বলে কয়ে সে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। আবার টেবিলের পানে তাকাতেই আরও অবাক্, এই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কে এসে টেবিলে একজনের মত খাবার রেখে গিয়েছে।

রাগ খুবই হচ্ছিল—এদের আদব-কায়দার ইতরোমি দেখে। অতিথির সঙ্গে কথা কয় না, কেমন ধারা লোক এরা? বিশেষ করে ঐ মার্থা সিমসন? আজ এত বছর ধরে যাদের চাকরি করে এলি, তাদের সঙ্গে এইরকম পুতুলনাচের অভিনয়?

কিন্তু রাগ যতই হোক, ক্ষিধে হয়েছিল তার চেয়ে বেশী। মনের রাগ মনেই রেখে প্লেটের ঢাকনা খুলে ফেললাম। বাঃ, বাঃ, যা ভেবেছিলাম, তাই দেখছি। এক প্লেট হরিণের মাংস। কিন্তু কী আশ্চর্য! তার সঙ্গে আর কিছুই না, এক টুকরো রুটিও না।

যা হোক আমি খেলাম। আর খাওয়া শেষ হতে-না-হতেই মিসেস সিমসনকে দেখা গেল দোরগোড়ায়, সে যেন ডেকে বলছে কাকে—"একটা আলো নিয়ে তুমি জোসেফকে শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসো। তেতলার লাল কামরায় ওর জন্য বিছানা করা হয়েছে—"

তেতলার লাল কামরা? কথাটা আগেও যেন শুনেছি কোথায়? মনে পড়ছে না, কিন্তু সে কথা থাকুক, নীচের তলায় এবং দোতলায় এক শো ঘর থাকতে তেতলায় কেন? ঐ সিঁড়ি

দিয়ে তেতলায় ওঠা সোজা? সরু সরু ধাপ, চল্‌টা-ওঠা, ছোট বড় গর্তে-ভরা—

কিন্তু অতিথি আমি, শোবার ঘর নিয়ে ঝগড়া করা চলে না। আর ঝগড়া করাই বা কার সঙ্গে? মিসেস সিমসন আবার হাওয়া দিয়েছে, তার জায়গায় দেখা দিয়েছে এক দাসী, হাতে তার মোমবাতি, সে পথ দেখাবার জন্য প্রস্তুত।

দাসী আগে আগে চলেছে মোমবাতি হাতে নিয়ে। সিঁড়িতে হাওয়ার বেশ দাপট, আলোটা কাঁপছে, দপদপ করছে, নিবেও যেতে চাইছে এক একবার। দু ধারে এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালে নানারকম ছায়ার ভূতনাচন। তারই মধ্যে সিঁড়ির ধাপে ধাপে মশমশ শব্দ উঠছে আমার ফ্লেক্সের জুতোর। অনেক- অনেক ধাপ সিঁড়ি। উঠেই চলেছি, উঠেই চলেছি—

উঠেই চলেছি, উঠেই চলেছি—

ব্যস, আর না—স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই আমার প্রথম বারের স্বপ্ন।

দ্বিতীয়বার এই স্বপ্নই দেখেছিলাম একেবারে পনেরো বছর পরে।

এই পনেরো বছরে পরিবর্তন এসেছে অনেক। মিসেস সিমসন চলে গিয়েছে। আমার বয়স যখন বছর বারো, গিয়েছে তখনই। আমরা তাড়াই নি। নিজের খুশীতেই চলে গেল। কী একটা কথা শুনেছিলাম, বরাত নাকি খুলে গিয়েছে তার। বিয়ের পরেই স্বামী আমেরিকায় চলে যায় কী জানি কিসের ব্যবসা করার জন্য। সেখানে বেশ দু-পয়সা জমিয়ে নিয়ে সে স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছে সেখানেই।

যাক মিসেস সিমসন, আয়ার আর দরকারও ছিল না আমাদের। ছোট বোন আগাথার বয়সই দশ তখন, আয়া দিয়ে আমরা করব কী? ওর বরাত খুলেছে, ভালই। সুখে থাকুক। আমরা আস্তে আস্তে ভুলে গেলাম ওর কথা।

ভুলেই গিয়েছিলাম, আচমকা মনে পড়ল এগারো বছর পরে। আমি তখন এয়ার-ফোর্সের কাজ শিখছি। আছি মালয় দেশে। সেইখানে ঐ স্বপ্নটাই দেখলাম দ্বিতীয় বার।

একদিন প্লেন চালাচ্ছে ও'নীল, আমি তার পাশেই বসে আছি শিক্ষানবীস হিসাবে। আরোহী আমরা এই দুইজনই।

প্লেন বিগড়ে গেল দৈবাৎ। ও'নীল পাকা পাইলট, জ্বলন্ত প্লেনটাকে সময় থাকতে নামিয়ে ফেলল এক তেপান্তর মাঠে। সময় থাকতে বলছি এইজন্য যে, প্লেন যদিও ছাই হয়ে গেল, আমরা দুজন প্রাণে বেঁচে গেলাম! হাতে-পায়ে চোট লেগেছিল বই কি, তবে মারাত্মক কিছু নয়, দুই দিন সেই মাঠে পড়ে থাকবার পরে হাঁটা-চলার শক্তি ফিরে পেলাম আবার।

হাঁটছি, ও'নীল আর আমি। জ্বলন্ত প্লেন থেকে খাবার জল যেটুকু টেনে বার করেছিলাম, তা ফুরিয়ে গিয়েছে এই দুই দিনে। আজ বেলা দুটো এখন, পেটে কিছু যায় নি। মাথা ঘুরছে, পাও টলছে। ও'নীল বলল—"একটু না বসে আর পারছি না হে!" আমি বললাম—"ঠিক আছে। ঐ ঝোপটার ভিতরে ছায়া আছে, যদিও ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপ থাকাও সম্ভব।"

"প্লেনের আগুনে মরিনি, এখন কি সাপের কামড়ে মরব?" এই বলে ও'নীল ঝোপে ঢুকে সটান শুয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, আমিও পিছনে পড়ে রইলাম না!

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম, ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন। পনেরো বছর আগের সেই স্বপ্ন। এবারকার ভূমিকায় অবশ্য সাপ ছিল গোটা দুই, কারণ ঘুমের অব্যবহিত আগে সাপের কথাই আলোচনা করছিলাম ও'নীলে আমাতে মিলে।

একেবারে জোড়া শংখচূড় হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল ঝোপের ভিতরে। তাদের তাড়ায় ও'নীল পালাল একদিকে, আমি অন্য একদিকে। তাড়া করেই চলেছে সাপ, আমরাও ক্রমাগত পালাচ্ছি। অবশেষে ও'নীলকে আর দেখতে পেলাম না।

বহু দূরের এক রবার বাগানে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে সাপ যেন নিরস্ত হলো, বোধ হয় ফিরে চললো তার সাথীর কাছে। আমি কিন্তু আমার সাথীর সন্ধানে আর ফিরলাম না, কারণ একে আমার আর হাঁটার শক্তি ছিল না, তায় ফিরে গিয়ে ও'নীলকে আগের জায়গায় দেখতে পাব না বলেই ধারণা আমার। উলটো দিকে ছুটতে ছুটতে সে কোথায় গিয়ে পড়েছে, তার ঠিক কী!

রবার বাগানেই আমি এদিক ওদিক ঘুরছি ধুঁকতে ধুঁকতে, এমন সময় পেল্লায় এক ভাঙ্গা বাড়ি পড়লো সামনে। তারপরে পনেরো বছর আগেকার সেই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি। দরজায় কড়া-নাড়া, মিসেস সিমসনের আবির্ভাব, এবারেও তার মুখ বুড়ীর মত, সেই নির্বাক অভিনয়। ভোজনের পরে সেই কণ্ঠস্বর—"আলো ধরে মিস্টার রেমিংটনকে তেতলার লাল কামড়ায় পৌঁছে দাও"—তারপরে সেই চল্‌টা-ওঠা সরু সিঁড়ি, দুইধারে এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল—

আর সেই সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতেই স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া। দেখি, ও'নীল আমার পাশেই ঘুমুচ্ছে তখনও।

তৃতীয়বারের স্বপ্ন এই হালের ব্যাপার, এবারেও এগারো বছরের ব্যবধানে। রয়েছি লণ্ডনে, এয়ার ফোর্স দপ্তরেই কাজ করছি। একটুখানি দোস্তি হয়েছে হ্যারি শেরিডানের সঙ্গে। সুবাদ এই যে এক অফিসে চাকরি করি, আর বয়সও দুজনের সমান। সে এসে বলল—তার বিবাহ-বার্ষিকী পরশু দিন, ডিনারে বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই আসবেন, আমারও যাওয়া চাই। থাকে ওরা শহরতলি নেলসন ভিলে, রাত্রে ওখানেই থাকতে হবে, কারণ ডিনারের পরেও নাচটাচ আছে। আমি বললাম—"তথাস্তু।"

আর সেই রাত্রেই দেখলাম স্বপ্ন। নেলসন ভিল শহরতলিতে যাই নি কখনো, ও-নামের শহরতলি যে আছে একটা, তাও জানা ছিল না। স্বপ্নে দেখলাম—নামেই ওটা শহরতলি, বাস্তবে আজ পাড়াগাঁ। ইলেকট্রিক রেডিও টেলিফোন—এসব আছে, কোন্ গ্রামেই বা না আছে আজকাল? কিন্তু রাস্তাঘাট সেকেলে, বাড়িঘরও বেশির ভাগ তাই।

ঠিক না মিলিয়ে মিলিয়ে যে বাড়িতে পৌঁছোলাম, সে এক পেল্লাই ভাঙ্গা বাড়ি, তার কড়া নাড়তেই দোর খুলে দিল মিসেস সিমসন। তারপর, খাওয়ার দাওয়া পরে—

এবারে বাড়ি ফাঁকা নয়, অনেকগুলি অতিথি। তবু তাদের মধ্যে থেকে আমাকেই বেছে নিয়ে তেতলার লাল কামরায় পাঠালে সিমসন বুড়ী। সেই সরু সরু চল্‌টা-ওঠা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দাসীর পিছনে পিছনে আমি উঠছি যখন, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। রেগে মেগে নিজের গালে ঠাস ঠাস করে চড়াতে লাগলাম এ-ছাই স্বপ্ন কি সারাজীবন জ্বালাবে আমায়?

কিন্তু স্বপ্ন দেখেছি বলে তো আর নিমন্ত্রণ বাতিল করতে পারি না! যথাসময়ে সেজে-গুজে রওনা হলাম নেলসন ভিল। জায়গাটার চেহারা দেখেই ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। স্বপ্ন মিথ্যে! স্বপ্ন মিথ্যে! দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরতলি, জঙ্গল-টঙ্গল তেমন কিছু না। রাস্তাঘাট আলোয়-আলোয় ঝলমল! ভগবান রক্ষে করেছেন, স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে।

বাড়িটা অবশ্য—হ্যাঁ বাড়িটা, ভাঙা নয় অবশ্য, কিন্তু স্বপ্নে কয়েকবার যে-রকম বাড়ি দেখা গিয়েছে, তার আদল কিছু আছে যেন বাড়িটাতে। হাল-ফিল রং-চং করা হয়েছে, তা যদি না করা হত, আদলটা আরও কত বেশী প্রকট হতে পারত, ভাবতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম।

দোরগোড়ায় অভ্যর্থনা করল—মিসেস সিমসন নয়। ভগবান রক্ষে করুন, অভ্যর্থনা করল স্বয়ং হ্যারি শেরিডান, স্বপ্ন আবারও মিথ্যে হল। জয় ভগবান।

মিসেস শেরিডানের সঙ্গে আলাপ হল, উপহার যা এনেছিলাম, তার জন্য ধন্যবাদ পেলাম প্রচুর। দিব্যি সুন্দরী তরুণী বৌ হ্যারির। সপ্রতিভ হাসিখুশী। আমার কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে—মিসেসের মুখখানা আমি দেখেছি আগে। কোথায়

দেখেছি, তা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। ডিনারের আনন্দ, বল-নাচের হুল্লোড়—সব কিছুর ভিতরে ঐ মনে না করতে পারার অস্বস্তি ক্রমাগত খোঁচাতে থাকল আমাকে।

অনেক রাত পর্যন্ত চলল নাচ। নিমন্ত্রিতেরা থাকবেন সবাই আজ রাতটা। বাড়িটা বড়, কয়েকটা ফ্লাটে ভাগ করেছে মালিকেরা। শেরিডানেরা একটা ফ্লাট নিয়ে রয়েছে, তার মধ্যে এইসব অতিথির জায়গা হবে কোথায়?

না, এর মধ্যে জায়গা হবে না, তা জানে শেরিডানেরা! তাই আরও দুটো ফ্লাট এক রাতের জন্য চেয়ে নিয়েছে মালিকের কাছে। খালি ছিল দু-দুটো।

আমায় বিস্তু নিজেদের ফ্লাটেই রাখবে। এক অফিসের লোক, আমার খাতির বেশী তো হবেই! অন্য অতিথিদের যার যার ঘরে পৌঁছে দেবার পর মিসেস শেরিডান স্বামীকে হুকুম করলেন—"আলো দেখিয়ে তুমি মিস্টার রেমিংটনকে তেতলার লাল কামরায় পৌঁছে দিয়ে এসো। ওঁর বিছানা ওখানেই করা হয়েছে।"

আমি বজ্রাহত। এবারে আর স্বপ্ন নয়। জোরে জোরে চিমটি কাটতে লাগলাম গালে গলায় বাহুতে। লাগছে তো! প্রচণ্ডভাবে লাগছে! স্বপ্ন নয় তাহলে। এবার আর স্বপ্ন নয়।

তবে চল্‌টা-ওঠা সরু সরু সিঁড়ি বেয়ে বা এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালে এলোমেলো ছায়ার ভূতনাচন দেখতে দেখতে তেতলায় উঠতে হল না, এটাও বাঁচোয়া একটা। সিঁড়ি ভাল, দেয়াল তো ভাল।

দাসী আমায় পৌঁছে দিল ঘরে। একটি মাত্র ঘর তেতলায়। ভাল ঘর, বড় ঘর। আর হালেই লাল রংকরা। অনুমান করা যায়, বাড়িতে সম্মানিত অতিথি এলে তার রাত্রি-বাসের জন্যই এ-ঘর আলাদা করে রাখা হয়েছে। আসবাব বিছানা সব দামী।

আলগা মোম একটা নয়, মোমদানিই হাতে করে এনেছিল দাসী। টেবিলে সেইটি বসিয়ে রেখে দাসী শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল। আমি শোবার জন্য তৈরী হলাম। পোশাক ছাড়তে ছাড়তে ঘরখানা পর্যবেক্ষণ করছি। দেয়ালে ছবি রয়েছে, কয়েকখানাই রয়েছে। একখানা তো দেখছি খুব বড় ছবি। দামী ফ্রেমে বাঁধানো। কী ছবি? কৌতূহল হল দেখবার। মোমদানিটা উঁচু করে ধরলাম ছবির সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে একঝলক বিদ্যুৎ বয়ে গেল আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। ভাল করে দেখবার জন্য আমি চেয়ারখানা টেনে নিলাম ছবির কাছে। তার ওপরে দাঁড়িয়ে আবারও আলো উঁচু করে ধরলাম।

মিসেস সিমসন নির্ঘাৎ মিসেস সিমসন!

আয়া সিমসনকে যে চেহারায় আমাদের শৈশবে দেখতাম, সিমসনের সে চেহারা এ নয়। এ চেহারা বুড়ী সিমসনের। সে চেহারার সঙ্গেও পরিচয় আমার হয়েছে কয়েকবার।

স্বপ্নে যখনই মিসেস সিমসনকে দেখেছি, বুড়ীর চেহারাতেই দেখেছি তাকে।

চেয়ারের উপরেই দাঁড়িয়ে আছি। হাঁ করে তাকিয়ে আছি ছবির দিকে। ছবির চোখে—এ কি আমার চোখের ভুল? কিন্তু আমার তো মনে হয়—ছবির চোখ বিজয়োল্লাসে জ্বলজ্বল করছে। সে দৃষ্টি যেন বলছে—"তাহলে এতদিন পরে পেয়েছি তোকে। অনেকদিন ঘোরাচ্ছিস তুই—"

কিন্তু এসব কী? আমি কি পুরুষমানুষ নয় না কি? ভয় পাচ্ছি কি বলে? কাকে ভয় পাচ্ছি? একটা ছবিকে? হাসির কথা নয়?

হ্যাঁ, কতকগুলো আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে গিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অনেক অনেক বছর ধরেই ঘটে এসেছে। কিন্তু আকস্মিক যোগাযোগ ছাড়া আর কী হতে পারে তা? যীশু কহো! ভয় তো নয়ই, ভাববার কিছু নেই এতে।

গলাটা দুই টুকরো হয়ে যাবে দাঁতের কামড়ে।
[পৃষ্ঠা ১৬৮

সিমসনের ছবি এখানে কেন এল? এই প্রশ্নেরও একটা জবাব যেন মাথায় আসছে। হ্যারির বৌ মিসেস সিমসনের মেয়ে হতে পারে। আমাদের বাড়ি থেকে মার্থা আমেরিকায় গিয়েছিল, স্বামীর কাছে। তারপর তার মেয়ে হতে পারে, যদি হয়ে থাকে, তার বয়স মিসেস শেরিডানের সমানই হওয়ার কথা। মেয়েই হয় যদি, তার বাড়িতে তার মায়ের ছবি থাকার বাধা কী?

নিশ্চয়ই মেয়ে। সেইজন্যই মিসেস শেরিডানকে দেখে আমার মনে হয়েছিল—ভদ্রমহিলাকে আগে দেখেছি কোথাও। ধারণাটা খানিকটা ভুল, খানিকটা খাঁটী। দেখেছিলাম ঠিকই ও-রকম চেহারা আগে। তবে যে-চেহারা বাইশ বছর আগেকার আয়া সিমসনের। মিসেস শেরিডানের এই যৌবনের চেহারা যখন আয়া সিমসনের ছিল, তখনকার।

যাক, এইভাবে নিজের মনকে ঠাণ্ডা করে নিয়ে শয্যাগ্রহণ করলাম আমি। রাত অনেক হয়েছে। এইবার না ঘুমোলে নয়। আলো নিবিয়ে দিলাম। ঘুমুই।

ঘুমিয়ে পড়েছিলামও।

হঠাৎ জেগে উঠলাম দারুণ যন্ত্রণায়। আমায় চেপে ধরে কোন হিংস্র জন্তু যেন দাঁত বসিয়ে দিয়েছে আমার গলায়। গলার ভিতর বসে যাচ্ছে গোটা দাঁতের পাটি।

পরিত্রাহি চিৎকার করে আমি জন্তুটাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য প্রাণপণে ঝটাপটি শুরু করলাম। রীতিমত বলবান পুরুষ আমি, তবু আততায়ীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হল না আমার পক্ষে। বেশ টের পেলাম—রক্তে ভিজে যাচ্ছে বিছানা। ভয় হল— গলাটা দুই টুকরো হয়ে যাবে ঐ দাঁতের কামড়ে।

ভয়ে যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ছি, এমন সময়ে দুপদাপ শব্দ সিঁড়িতে, হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল হ্যারি শেভিডাম আলো হাতে নিয়ে। "কী? কী? কী? জোসেফ, হল কী?"—ক্রমাগত চিৎকার করছে হ্যারি, আর আমার উপর থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করছে আমার আততায়ীকে।

পরের দিন জ্ঞান হলে শুনলাম—সে আততায়ী আর কেউ নয়, একখানা ছবি। মিসেস সিমসনের ছবিখানা। কিন্তু –

ছবি ছিঁড়ে পড়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু ছবির দাঁত যদি জ্যান্ত মানুষের গলা কামড়ে প্রায় দুই টুকরো করে ফেলে সেটাকে আশ্চর্য বলে স্বীকার না করা মুশকিল। ছবির দাঁতে ঠোঁটে রক্ত সপসপ করছে তখনো।

হাসপাতালে আমাকে কাটাতে হল প্রায় তিন মাস।

যখন সুস্থ হয়ে ফিরলাম হাসপাতাল থেকে, হ্যারিকে চেপে ধরলাম আমি—"তোমার শাশুড়ীর শেষ জীবনের ইতিহাস আমায় বলতেই হবে। তুমি না জানতে পার তা, কিন্তু তোমার বৌ নিশ্চয়ই জানে—"

হ্যারি মুখ নীচু করে ধরা গলায় বললে—"সে জানে। আমাকেও বলেছে ইদানীং। আমেরিকায় গিয়েছিল তো শাশুড়ী। আদিম ইণ্ডিয়ানদের ভিতর পিশাচের পূজারী আছে এক সম্প্রদায়! তারা জ্যান্ত থাকতেও রক্ত খায়, মরে যাবার পরেও পিশাচ হয়ে রক্তপানের সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। তাদেরই চ্যালা হয়েছিল বুড়ীটা।"

বুঝলাম। কেন পিশাচী আমার রক্তপান করল, বুঝলাম সেইটুকুই। কিন্তু বুঝলাম না অন্য একটা কথা। আমেরিকায় যাওয়ার আগেই সে যে তেতলার লাল কামরার কথা শুনিয়েছিল আমাকে, সেটা কি করে সম্ভব হল?

আমি বা হ্যারি বা হ্যারির বৌ কেউ আমরা সমাধান করতে পারি নি এ সমস্যার।

ছবিখানা? পুড়িয়ে ফেলেছে হ্যারি।

---

* ই. এফ. বেনসন-এর "রুম ইন দ্য টাওয়ার" অবলম্বনে।

বিক্রমাঙ্ক ত্রিভুবন মল্ল

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

সে কী? স্বয়ম্বর?

স্বয়ম্বর-প্রথার প্রচলন তো ছিল সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগে! কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের তিন হাজার বৎসর পরে পাণ্ডববর্জিত এই দক্ষিণতম ভারতে স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান কে করে? কোন্ কুমারীকে পতিনির্বাচনের সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন?

এ কুমারীর নাম মধুরান্তিকা, চোলরাজ বীর রাজেন্দ্রের কন্যা। রূপে-গুণে অতুলনীয়া। জ্যাঠতুতো ভাই তৃতীয় রাজেন্দ্রের গর্বের শেষ নেই এই বোনটিকে নিয়ে। কটমটো নামটাকে সংক্ষেপ করে নিয়েছেন 'মধুরা'তে, ও-নামে ডাকতেও সুবিধে, ও-নাম শুনতেও মিষ্টি।

তৃতীয় রাজেন্দ্রই এখন কাঞ্চী কর্ণাটের রাজা, চোল সম্রাটবংশের শেষ গৌরব-রবি। ওঁর পিতৃব্য রাজাধিরাজ জয়মুকুন্দ চোল যখন কৃষ্ণাতীরে কোপ্পাম-এর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন, একান্তই বালক তখন উনি। কিন্তু সেই গ্লানির দিনের স্মৃতি কী-জানি-কেমন-করে রক্তের অক্ষরে দাগ কেটে বসেছে তাঁর অন্তরে। চালুক্যদের নাম শুনলেই তিনি জ্বলে ওঠেন এখনও।

দাক্ষিণাত্যের সব রাজা ও রাজপুত্রকেই জানেন রাজেন্দ্র। জানেন উত্তরাপথেরও অনেক নরপতিকে। কাউকেই মধুরার যোগ্য স্বামী বলে মনে হয় না তাঁর। তবে কি

জেনে-শুনে অপদার্থের হাতে সঁপে দিতে হবে এই সোনার কমলটিকে? তাতে মনটা খুঁতখুঁত করবে রাজেন্দ্র চোলের। অগত্যা এই স্বয়ম্বর। কেন নিজে বেছে নিক। তাহলে পরে আর ভাইকে দোষী করতে পারবে না, স্বামী যদি মনোমত না-ও হয়।

ভারতের প্রতি রাজধানীতে নিমন্ত্রণ চলে গেল দূত মারফৎ। গেল না কেবল চালুক্য-রাজধানী কল্যাণনগরে। ঐ চালুক্যরাজা সোমেশ্বরই ছিলেন কোপ্পাম যুদ্ধে রাজাধিরাজের প্রতিপক্ষ। স্বজনহন্তার পুত্রকে ভগ্নীদান করতে একান্তই অনিচ্ছুক রাজেন্দ্র।

সোমেশ্বরেরই পুত্র ত্রিভুবনমল্ল এখন কল্যাণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। শোনা যায় সিংহের মত তেজীয়ান, আবার কার্তিকের মত ভীমসুন্দর পৌরুষশ্রীমণ্ডিত আকৃতি তার। হতো বোধ হয় মধুরার যোগ্য স্বামী, ঐ অভাগ্য চালুক্যটাই। কিন্তু তা হবার নয়। কোনমতেই না। রাজাধিরাজ চোলের মৃতদেহ অলংঘ্য অন্তরায় রয়েছে এ-মিলনের পথে।

এসে গেল স্বয়ম্বরের শুভদিন। কাঞ্চী রাজধানীর এমন নিপুণ প্রসাধন করেছে নানা শ্রেণীর শিল্পীরা যে আজ তাকে দেখে ইন্দ্রপুরী বলে ভ্রম হচ্ছে মানুষের। বিস্তীর্ণ প্রাসাদ-চত্বরে স্বর্ণখচিত নীল চন্দ্রাতপ, তার প্রত্যেকটা স্তম্ভ স্বর্ণফলকে মণ্ডিত। পারস্যদেশীয় সুচিত্রিত গালিচা দিয়ে সভাতল আবৃত, তার উপরে সারি-সারি স্বর্ণাসনে রাজা ও রাজপুত্রেরা সমাসীন।

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি। সখীজন সমভিব্যবহারে রাজকন্যা মধুরা মরাল-গমনে চলে যাচ্ছেন অতিথিবর্গের সমুখ দিয়ে। প্রত্যেকের দিকে একটিমাত্র দৃষ্টি খঞ্জননয়ন কোণ থেকে নিক্ষেপ করে করে। কাউকেই মনে ধরে না, দ্বিতীয়বার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কান্তিমান ব্যক্তি সেখানে একটিও নেই। অবশেষে,

সুখাসনের শ্রেণী যেখানে একেবারে শেষ হল—

সামান্য বেশে সজ্জিত এক সাধারণ সৈনিক নীরবে দণ্ডায়মান সেখানে।

সভারক্ষীরা এতক্ষণ তাকে মনে করছিল অতিথি কোন রাজার সহচর বলে। এ-সভায় অবশ্য সহচরদের উপস্থিত থাকবার কথা নয়। কিন্তু কখন যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে সবার অলক্ষ্যে, চোখে যখন পড়ল সে—রাজকন্যার পরিক্রমা তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, লোকটাকে নিষ্কাশিত করতে গিয়ে একটা অশোভন দৃশ্যের অবতারণা করতে উৎসাহ হয় নি কারও—

যা হোক, সেই সৈনিক, দণ্ডায়মান দীনবেশী সেই সৈনিকের দিকে একবার তাকিয়ে—দ্বিতীয়বার তাকাতে হলো মধুরাকে, তার ওপরে, তৃতীয়বার দৃষ্টি উন্মিলিত করার সঙ্গে সঙ্গে মধুরা হাতের শ্বেতপদ্মের মালা পরিয়ে দিলেন সেই সৈনিকেরই কণ্ঠে।

সভাস্থল এমন নিস্তব্ধ যে সূচীপাত হলে সে-শব্দও বুঝি কর্ণগোচর হয়। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তকালের জন্যই। তারপরই শতকণ্ঠে উঠল ধিক্কারে-ভরা অট্টহাস্য। অন্য শতকণ্ঠে উঠল অমর্ষ-ভরা ক্রুদ্ধ গর্জন। অপমান! অনার্য আচরণ! জঘন্য রুচি!—বিভিন্ন চিৎকার শোনা যেতে থাকল বিভিন্ন কণ্ঠ থেকে।

সহসা সেই অশালীন কলরব ছাপিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে কথা কয়ে উঠলো রাজকন্যা মধুরার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ—"রাজগণের এসব তর্জনের হেতু কী? স্বয়ংবরে আহূত হয়ে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা তো অবশ্যই জানেন—স্বয়ংবর শব্দের অর্থ কী! যাকে আমার অভিরুচি হবে, মালা দেব তাঁকেই। দিয়েছিও তাই। রাজপদের অধিকারী না হলে বর-মালারও অধিকারী হতে পারবেন না কেউ, এমন কোন কথা তো ছিল না।"

রাজারা ক্রুদ্ধ হয়ে করবেন কী! তাঁরা যুদ্ধ করবার জন্য তৈরী হয়ে আসেননি, প্রত্যেকের সঙ্গেই মুষ্টিমেয় দেহরক্ষী মাত্র! অনুযোগ? তাই বা তাঁদের করবার অধিকার কোথায়? রাজকন্যা সংগত কথাই বলেছেন, রাজাদের মধ্য থেকেই তিনি পতি-নির্বাচন করবেন, এমন কোন প্রতিশ্রুতি তাঁর তরফ থেকে দেওয়া হয় নি।

চোলরাজ তৃতীয় রাজেন্দ্রও ভগ্নীর আচরণে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাঁর যা বোঝা-পড়া, সেটা ভগ্নীর সঙ্গে পরে করলেই হবে। উপস্থিত তাঁর প্রথম করণীয় হলো—অতিথি রাজাদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো। অবশ্য ক্রোধের মুখে অনেক রাজা হয়তো খেতেই চাইবেন না তাঁর গৃহে। তবু দেখতে হবে চেষ্টা।

এদিকে অজ্ঞাত-কুলশীল সৈনিকের গলায় মালা পরিয়ে দেবার পরে রাজকন্যা তারই সমুখে দাঁড়িয়ে আছেন নতমুখী হয়ে। ভাবটা এই—"এখন তুমি যা করতে বলবে, তাই করব আমি।" সখীরা কানে কানে বলছে—"রাজকন্যা, গৃহে চল।" সে কথার কোন উত্তর নেই। বিবাহের পরে পিতৃগৃহ তো আর গৃহ নয়!

ব্যাপারখানা বুঝেছে বই কি সৈনিক! সে মৃদু-মধুর কণ্ঠে মধুরাকে সম্বোধন করে বলল—"রাজকন্যে, যে মহৎ সম্মানের যোগ্য বলে তুমি এই অভাজনকে বিবেচনা করেছ, তা আমি সত্যিসত্যি পেতে পারি কি না, এক দণ্ডের মধ্যেই তার মীমাংসা হয়ে যাবে। তোমার দাদা ফিরে আসার অপেক্ষায় কিছুকাল তো এখানে আমাদের থাকতেই হবে!"

এমন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে কথা কইতে পারে শুধু সেই লোক, নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে পুরোমাত্রায় সচেতন। রাজকন্যা নিশ্চিন্ত। তিনি অপাত্রকে বরণ করেন নি। এ ব্যক্তি দীন হয়তো হতেও পারে, হীন কখনো নয়। অপ্রত্যাশিত মর্যাদা লাভ করেও এ না হয়েছে বিব্রত, না হয়েছে আহ্লাদে আটখানা। এমন কি, দুশো রাজা যখন

তর্জন করছিল সমস্বরে, তখনও তিলমাত্র সন্ত্রস্ত ভাব দেখায় নি সে। এ-সৈনিক মহাবংশের সন্তান, তাতে সন্দেহ নেই।

রাজমন্ত্রী সুভদ্র এলেন ব্যস্তভাবে, করজোড়ে মিনতি করে বললেন—"মহাত্মন্! বিশ্রাম কক্ষে আসুন। মহারাজ অতিথিদের নিয়ে কী সংকটে পড়েছেন, তা তো বুঝতেই পারছেন। প্রচলিত রীতিনীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে অনেকখানি, তা মানি। কিন্তু পরিস্থিতি বিচারে তা যে অনিবার্য, এবং ক্ষমার্হ—"

মন্ত্রীর বাগ্‌জালে কি সৈনিক বিরক্তই হয়েছিল একটু? তিনি মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন—"আপনি ব্যস্ত হবেন না আর্য! বিশ্রামের প্রয়োজন হয় তো আমার আছে, আছে আমার সহচরদেরও। আপনি দয়া করে তাদের ডাকেন যদি, তাদের নিয়ে আমি এইখানেই বিশ্রাম করতে চাই। আমার দৈবলব্ধ নববধূকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ারও একটা সুযোগ পাই আমি। এই সভাগৃহের বাইরে জনতা জমেছে একটা। তাদের সমুখে দাঁড়িয়ে আপনি একটু চড়া গলায় ডাকেন যদি তাদের "বরযাত্রীরা আসুন" বলে—

"বরযাত্রীরা আসুন?"—মন্ত্রী বিস্ময়ে হতবাক্—"আপনিই যে বর হয়ে দাঁড়াবেন আজ, তা তাঁরা আগে থেকেই জানতেন?"

"না, তা জানতেন না। তবে আমি বর পদবী না লাভ করলে তাঁদের তো কেউ ডাকতো না ভিতরে আসবার জন্য! সংকেতটা আগে থেকেই স্থির করা আছে আমাদের মধ্যে। ডাকতে আপনার যদি অসুবিধা থাকে, আমিই যাচ্ছি বাইরে, আমার বধূকে নিয়ে। ওঁকে কাছ ছাড়া করতে আমার সাহস নেই আপাততঃ।"

চোখে চোখে মধুরার সঙ্গে কি বার্তা বিনিময় হয়ে গেল একটু?

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আর কথা বাড়াতেও সাহস হচ্ছে না। লোকটার ভিতরে রহস্য আছে কিছু। এবং রহস্যাবৃত বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হলে সতর্ক হয়েই করা উচিত। তার উপরে এ আবার রাজার বোনাই হয়ে বসেছে হঠাৎ। সে-ব্যাপার কোন্ দিকে মোড় নেবে, তার ঠিক কী? এখন যদি একে চটিয়ে দেওয়া যায়, আর তার পরেই যদি রাজা এসে একে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন, মাঝখান থেকে মন্ত্রী বুড়োই মারা পড়বে, সুতরাং, মন্ত্রীর এখন হতে হবে দ্বিগুণ সতর্ক।

তিনি নিজে গেলেন না, কিন্তু প্রতিহারীকে ডেকে বলে দিলেন—"বাইরে গিয়ে একবার 'বরযাত্রীরা আসুন' বলে হাঁক দাও তো!"

প্রতিহারী চলে গেল মুচকি হেসে, তারপরই তার উচ্চ কণ্ঠের আহ্বানও শোনা গেল বাইরে থেকে। আর তার পরই—

রাজেন্দ্র বেণী ধরে নাড়া দিলেন মধুরার। [পৃষ্ঠা ১৭৪

পিলপিল করে, একের পরে এক, তারপরে আরও এক, তারও পরে—

মন্ত্রীর চোখ ছানাবড়া। পঞ্চাশ অবধি গুনে তিনি আর গুনতে পারলেন না। সাধারণ সৈনিকের বেশ, কিন্তু প্রত্যেকটা লোক যে দক্ষ যোদ্ধা, তা তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। প্রত্যেকে এসে নিঃশব্দে বরের পিছনে দাঁড়াল। এক সারি পাষাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ তারা। একশোটা মূর্তি তো বটেই!

বর ঘুরে দাঁড়ালেন এমনভাবে, যাতে মধুরা পড়েন তাঁর ডান দিকে, আর নবাগত সৈনিকেরা পড়ে বাঁয়ে। এইভাবে দাঁড়িয়ে তিনি মধুরার দিকে হস্তপ্রসারণ করে সৈনিকদের সম্ভাষণ করে বললেন—"প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের রানীকে প্রণাম কর।"

যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, একশোটা সৈনিক সেইখানে মতজানু হয়ে বসে যুক্তকর ললাটে ঠেকিয়ে প্রণাম করল নিঃশব্দে। প্রথমে মধুরাকে, তারপর বরকে।

আর সেই মুহূর্তেই চোলরাজ তৃতীয় রাজেন্দ্র এসে প্রবেশ করলেন। "আপনি চালুক্যরাজ ত্রিভুবন মল্ল?" প্রশ্ন করলেন তিনি স্মিত হাস্যে।

"যাকে আপনি নিমন্ত্রণ করেন নি"—উত্তর দিলেন বর।

"উভয় পক্ষেরই অনেক কিছু আছে ভুলে যাওয়ার মত। আপনি যদি সাম্প্রতিক এই সামান্য ত্রুটিটা মার্জনা করতে পারেন, তাহলে আমিও অতীতের বৃহৎ অভিযোগ ভুলে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। এই পাগলীটার মুখ চেয়ে।"

এই বলে রাজেন্দ্র বেণী ধরে নাড়া দিলেন মধুরার।

এতক্ষণে নহবতে সানাই বেজে উঠল মোহনিয়া মধুস্বরে। কাঞ্চী রাজধানী আনন্দে মুখর। শুধু রাজকন্যার বিবাহ-উপলক্ষেই নয়, চোল-চালুক্য যুগল শক্তির পুরুষানুক্রমিক শত্রুতার অবসানও এই আনন্দ উচ্ছ্বাসের অন্যতর কারণ।

নববধূ নিয়ে কল্যাণে ফিরে গেলেন ত্রিভুবনমল্ল। সেখানে দুঃসংবাদ ওৎ পেতে আছে তাঁর প্রতীক্ষায়। ভ্রাতা জয়সিংহ করেছেন বিদ্রোহ।

রাজা যখন চালুক্য রাজধানীতে গেলেন, বিনা-নিমন্ত্রণে, স্বাহুত অবাঞ্ছিতের মত, জয়সিংহ ভাবলেন তাঁর ভাগ্যে এসেছে সুবর্ণ সুযোগ একটা। চিরশত্রু চোল কি হাতে পেয়েও ছেড়ে দেবে ত্রিভুবনকে? আর হাতে তো তিনি পড়বেনই ওদের! যাচ্ছেন স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে, সেখানে একটা প্রাণীও চিনবে না চালুক্যরাজকে, এও কি সম্ভব? বরমালার বদলে গলায় যে লৌহশৃঙ্খল পরিধান করতে হবে হঠকারী ত্রিভুবনকে, এ তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন।

আর তা যদি হয়, জয়সিংহের রাজ্যলাভ ঠেকায় কে? কনিষ্ঠ ভাই বিজয়াদিত্যও আছেন বটে, কিন্তু বড় বর্তমান থাকতে ছোট পাবে সিংহাসন, এটা কোন শাস্ত্রে লেখে না। তবু শাস্ত্রবিধানের পশ্চাতে অস্ত্রবল কিছু থাকলে ভাল হয়। গোপনে গোপনে অস্ত্রসজ্জা করতে থাকলেন জয়সিংহ। বলা বাহুল্য সেকথা গোপন রইল না।

জয়সিংহের দুর্ভাগ্য, মন্ত্রী সেনাপতিরা ত্রিভুবনের একান্তই অনুরক্ত এবং রাজার অনুপস্থিতিতে তাঁরা অতিমাত্র সজাগ। জয়সিংহের উদ্যোগ আয়োজনের কথা অচিরেই তাঁদের গোচরে এসে গেল। এবং সম্ভাব্য বিদ্রোহ অঙ্কুরেই দমন করবার জন্য তাঁরা তৎপর হয়ে উঠলেন। যে স্বল্পসংখ্যক কুচক্রী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জয়সিংহকে, তারা ভয় পেয়ে দেশত্যাগ করল। জয়সিংহও অনন্যোপায় হয়ে অনুসরণ করলেন তাদেরই দৃষ্টান্ত।

কোথায় যাবেন? পল্লব রাজারা এখন হীনবল, ঐ কাঞ্চীরই অধীশ্বর ছিলেন তাঁরা এককালে, এই চালুক্যদেরই আক্রমণে স্বরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁরা। তাঁদের কাছে গেলে তাঁরা চালুক্যবংশীয় জয়সিংহকে সাহায্য করবেন, না কারাগারে নিক্ষেপ করবেন, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার উপায় নেই। সুতরাং ও কাজ করা ঠিক হবে না।

বাকী রইল চের, পাণ্ড্য, কদম্বেরা। তারা কখনোই ত্রিভুবনমল্লের সঙ্গে গায়ে-পড়া হয়ে বিরোধ করতে আসবে না। এক কলিঙ্গ যদি—

নাঃ, কলিঙ্গ এখান থেকে বহুদূর। তারা কোন প্রয়োজন বুঝবে না চালুক্যদের

ব্যাপারে নাসিকা প্রবেশ করাবার। স্বার্থ কী? স্বার্থ বিনা রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা পিঁপড়েও নড়েচড়ে না।

তবে কি জয়সিংহ বেঘোরে মারা পড়বেন?

চিন্তা করতে করতে এক দুর্বুদ্ধি মাথায় এল জয়সিংহের। কলিঙ্গের চাইতে বেশী দূর নয়। তবে কলিঙ্গের উলটো দিকে। তিনি রওনা হয়ে পড়লেন সিন্ধুদেশের উদ্দেশে। ডুবেছি, না ডুবতে আছি। আশ্রয় নেব আরবদের। পারস্য-সুলতান বায়জিদের আদেশই আছে সিন্ধুর সুবেদারদের উপরে—যে কোন সুযোগ আসুক ভারতীয় রাজাদের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করবার, তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা চাই। আর্থিক ও সামরিক, সব রকম সাহায্য দিতে হবে প্রার্থীকে। কিছু-না-কিছু সুবিধা তাতে হবেই। রাজ্যবিস্তারের সুবিধা না-ও যদি হয়, প্রভুত্ব বিস্তার ঘটবেই অন্ততঃ।

কাঞ্চী থেকে ফিরেই ত্রিভুবনমল্ল পেলেন এই দুঃসংবাদ। না, পুরো সংবাদটা নয়, কারণ জয়সিংহ যে আরবদের কাছে আশ্রয় নিতে গিয়েছেন, তা এখন পর্যন্ত জানে না কেউ। জয়সিংহ দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, এইটুকুই রাজা জানতে পারলেন অমাত্যদের কাছ থেকে। কী করবেন? প্রতিবেশী সব রাজাদের কাছে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন—জয়সিংহ যদি তাঁদের কারও কাছে যান, তাঁকে নির্ভয়ে দেশে ফিরে আসতে বলা হয় যেন। স্নেহশীল অগ্রজ তাঁকে অযাচিতভাবেই ক্ষমা করে বসে আছেন।

এই চিঠির বয়ান যখন আচার্য বিজ্ঞানেশ্বরের কানে এল, তখন তিক্ত বাদানুবাদ শুরু হল আচার্য আর রাজার মধ্যে। বিজ্ঞানেশ্বর কল্যাণের অন্যতম সভাপণ্ডিত, অগাধ পাণ্ডিত্যের গর্বে রাজাকে সমীহ করেন অল্পই। তিনি স্পষ্টই বললেন একদিন—"বিদ্রোহীকে ক্ষমা করার অধিকার রাজার নেই, তা নয়। কিন্তু ক্ষমাটা করতে হবে রাজা হিসাবে, আত্মীয় হিসাবে নয়। ভাই বলেই জয়সিংহকে ক্ষমা করার অধিকার ত্রিভুবনমল্লের নেই। কারণ, ক্ষমা পেলেই যে জয়সিংহের চরিত্র সংশোধন হয়ে যাবে, এমন নিশ্চয়তা কে দিচ্ছে? ভবিষ্যতে তিনি আবারও চক্রান্ত করবেন, বিদ্রোহ করবেন, রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্নও করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড না হোক, অন্ততঃ দীর্ঘদিনের কারাদণ্ডই হবে জয়সিংহের ন্যায্য প্রাপ্য।"

দেশপ্রেমিক মিতাক্ষরার প্রণেতা, নীতিশাস্ত্রজ্ঞবিদ বিজ্ঞানেশ্বরের কথার প্রতিবাদ করবে কে? মিতাক্ষরার প্রণেতা! যে-মিতাক্ষরার অনুশাসনে বঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশের রাষ্ট্রীয় ন্যায়নীতি নির্ধারিত হচ্ছে। রীতিমত বিপন্ন হয়ে পড়লেন ত্রিভুবনমল্ল। বিজ্ঞানেশ্বর ভারতগৌরব। কল্যাণে অধিষ্ঠানে করে রাজাকেই তিনি গৌরবান্বিত করছেন।

তাঁর শাসন না মানলে হয় তো এই দণ্ডেই তিনি এস্থান ত্যাগ করে চলে যাবেন। অন্য যে কোন দেশ সমাদরে গ্রহণ করবে তাঁকে।

কিন্তু এ সংকট থেকে জয়সিংহই উদ্ধার করলেন অগ্রজকে।

কল্যাণে সংবাদ নিয়ে এল গুপ্তচরেরা, সিন্ধুর সুবেদার মকদুম খাঁ রণযাত্রা করছেন চালুক্য অধিকার লক্ষ্য করে। রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে ছাড়া এদিকে আসার কোন পথ নেই অবশ্য, কিন্তু রাষ্ট্রকূটেরা আগেও আরবদের দিয়েছেন সে-সুযোগ, এবারও নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হয়েছেন দেবেন বলে। স্বজাতি প্রতিবেশীদের শক্তিহরণের মতলবে বিদেশীর আনুকূল্য করাকে তাঁরা পাপ বিবেচনা করেন না।

বেশ, রাষ্ট্রকূট থাকুন তাঁর বিবেক নিয়ে। মকদুম খাঁর মোকাবিলা করা কঠিন হবে বলে ত্রিভুবনমল্লের তো মনে হয় না। সাহায্য? না, সাহায্য তিনি কারও কাছে চাইবেন না। তবে পরিস্থিতিটা জানিয়ে দেবেন চের, পাণ্ড্য, পল্লব ও চোল রাজাদের। চোলরাজ তৃতীয় রাজেন্দ্র তো নতুন কুটুম্ব এবং রানী মধুরার সম্পর্কে একান্ত প্রিয়জন, তাঁর কাছ থেকে অযাচিতভাবেই সৈন্য-সাহায্য আসবে বলে প্রত্যাশা করছেন ত্রিভুবন। চোল-চালুক্য একত্র মিলিত হলে মকদুম খাঁকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে।

দিন আগত ঐ। মকদুম খাঁর গতিবিধির নিত্য নৈমিত্তিক বিবরণ এসে যাচ্ছে কল্যাণে। আজ তারা রাষ্ট্রকূট অধিকারে প্রবেশ করল, আজ সম্রাট তৃতীয় ধ্রুবর বিশেষ প্রতিনিধি এসে দেখা দিয়ে গেলেন আরব সেনার শিবিরে। আজ তারা চালুক্য-সীমান্তের দিকে অগ্রসর হল দীন-দীন রবে। তারা এগিয়ে আসছে আর ঢ্যাঁড়রা দিচ্ছে, নিজেদের কোন স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে নয়, তারা এ অভিযানে বেরুতে বাধ্য হয়েছে স্রেফ পরোপকারের জন্য। চালুক্য রাষ্ট্রের একাংশের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন রাজপুত্র জয়সিংহ, এবং হৃত উত্তরাধিকার ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় সাহায্য প্রার্থনা করেছেন সিন্ধুর সুবেদারের। এবং যেহেতু আশ্রিত শরণার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা ইসলামে নিষিদ্ধ হয়েছে, অতএব—

অতএব মকদুম খাঁকে রণযাত্রার এই তকলিফ স্বীকার করতে হয়েছে। জয়সিংহের দাবিটুকু আদায় হলেই তিনি ধূলো পায়ে নিজের জায়গায় ফিরে যাবেন, একটি দামড়িরও প্রত্যাশা না রেখে। তাঁর অভাব কী? আর তাঁর প্রভু মহামান্য খলিফার তো স্পষ্ট নির্দেশই আছে যে—

নির্দেশটা কী আছে—তা আর ভেঙে বলেন নি মকদুম খাঁ। সে-প্রশ্ন তুলে তাঁকে বিব্রতও করেন নি কেউ। প্রশ্ন ত্রিভুবনমল্লও করলেন না, তার বদলে তিনি সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন উত্তর পশ্চিমে। চালুক্য-অধিকারে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে আরব-

সেনা, সীমান্তেই তিনি তাদের বাধা দিলেন না কেন, এই নিয়ে কথা উঠেছে প্রতিবেশী রাজাদের মধ্যে, যাঁরা নাকি এ-পর্যন্ত নীরব দর্শক সেজে যার যার রাজধানীতে বসে আছেন, সোৎসুক দৃষ্টিতে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে।

হ্যাঁ, বসে আছেন তাঁরা। শুধু নিঃসম্পর্কীয় চের পাণ্ড্য বা শত্রুস্থানীয় পল্লবই নয়, নিকট কুটুম্ব চোলরাজও। সাহায্য ত্রিভুবন চান নি, সাহায্য পাঠানও নি রাজেন্দ্র। রানী মধুরা লজ্জায় মরে যাচ্ছেন ভ্রাতার আচরণে। ত্রিভুবন তাঁর লজ্জা স্খালনের জন্য বললেন—"মানুষ মাত্রেই স্বার্থান্বেষী, রাজা মাত্রেই সুযোগসন্ধানী। রাজেন্দ্র অখুশী হবেন না, আমাকে হতমান হতে দেখলে। চালুক্য রাহুগ্রস্ত হলে তো এ-অঞ্চলে চোলই মার্তণ্ডতেজে প্রকাশ পেত পারে আবার! চক্ষুলজ্জা আছে বলেই তিনি যোগ দেন নি মকদুম খাঁর সঙ্গে। নিরপেক্ষ সেজে দূরে দাঁড়িয়ে রণপয়োধির ঢেউ গুনছেন। জানেন না যে আমি পরাস্ত হলে মকদুমের পরবর্তী শিকার তিনিই হবেন।"

ঘোড়া ছুটল তাঁর ছত্রভঙ্গ সেনার পিছনে। [পৃষ্ঠা ১৭৮

যা হোক, সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন নি ত্রিভুবন, একটু অপেক্ষা করছিলেন এইটি দেখবার জন্য যে কল্যাণে আসবার কোন্ রাস্তাটা ধরেন মকদুম। দুটো পথ আছে, দুটোতেই সুন্দর সুযোগ আছে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলবার। কোন্ পথে সে-ব্যূহ গড়তে হবে, সে-বিষয়ে আগে নিঃসন্দেহ হতে চান ত্রিভুবন।

অবশেষে তিনি হলেন নিঃসন্দেহ। কুন্দন-পেট-এর পথে আসছে শত্রুসেনা। এইটিই

সংক্ষেপ রাস্তা অবশ্য, কিন্তু ও-রাস্তায় বিপদের আশঙ্কাও যে বেশী, যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ জয়সিংহ তো বলে দেন নি মকতুমকে। ফলে কুন্দন-পেট পৌঁছোবার পরেই বিষম বিপাকে পড়ে গেল সিন্ধুর সেনা। ঐখানে বাঁয়ে খরস্রোতা কৃষ্ণানদী, ডাইনে কুন্দন পাহাড়। উঁচু খুব বেশী নয়, কিন্তু একদম খাড়া। পাহাড় আর নদীর মধ্যে ব্যবধান দুশো গজের বেশী নয়।

সেই দুশো গজের মধ্যে বেধে গেল তুমুল যুদ্ধ। পথ আটকেছে চালুক্যরা। আগে থেকেই তারা উঠে বসে আছে পাহাড়ের মাথায়, আগে থেকেই নৌকায় চড়ে বসে আছে নদীতে। সমুখে তো রয়েছেই, প্রথমে শ্রেণীবদ্ধ পদাতিক বাহিনী, তাদের পৃষ্ঠরক্ষায় অশ্বারোহী সেনা।

উপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসছে। নদী থেকেও তাই। ডাইনে বাঁয়ে আক্রান্ত হয়ে সমুখ পানে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সৈন্ধবীদের। সেদিকে ভল্ল আর কুঠারধারী পদাতিক। তিন দিকের যুগপৎ আক্রমণে ঝটিকাহত কদলীবনের মত ধরাশায়ী হতে থাকল মকতুম খাঁর সেনা। অবশেষে, হাজার তিনেক সৈন্য যখন রণশয্যা গ্রহণ করল, মকতুম খাঁ বাধ্য হলেন পশ্চাৎপদ হতে। কিন্তু পশ্চাতেই বা যাবেন কোথায়? এইবার ঘোড়া ছুটল তাঁর ছত্রভঙ্গ সেনার পিছনে। চালুক্য অশ্বারোহীরা তরোয়াল হাতে নিয়ে ছুটছে আর পলায়মান আরবদের করছে কচুকাটা।

পালাতে পালাতে মকতুম খাঁ রাষ্ট্রকূট রাজ্যসীমায় যখন প্রবেশ করলেন অবশেষে, তখন তাঁর সঙ্গে হাজার সেনাও নেই। জয়সিংহ? তিনি বন্দী হয়েছেন।

বিজয়ী ত্রিভুবনমল্ল এই যুদ্ধের পরই উপাধি নিলেন বিক্রমাতঙ্ক। বিক্রম সংবৎ ও চালু করলেন তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিন থেকে শুরু করে। সভাকবি বিহ্লন কাশ্মীরী তৎপর হয়ে উঠলেন ছন্দোবন্ধনে তার কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখবার জন্য। প্রবাদোক্ত বিক্রমাদিত্যের মত চালুক্য বিক্রমাঙ্কেরও নবরত্ন সভা ছিল। বিজ্ঞানেশ্বর ও বিহ্লন সেই সভারই উজ্জ্বলতম যুগ্মরত্ন।

বন্ধু একেই বলে

অরুণ দে

টমাস ও ছোট ছেলেটার মধ্যে বন্ধুত্ব জমে উঠেছে।

একদিন রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। টমাস দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসেছিল।

হঠাৎ তার মনে হল কে যেন দরজার কড়া নাড়ছে। সে কান পেতে শুনল—সত্যি কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। এই শীতের রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে আবার কে এল ?

কি ভেবে দরজা খুলল টমাস। ঝড় আর বৃষ্টি তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু টমাস ঝড় বৃষ্টির কথা ভুলে গেল কারণ সে খুব অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সে দেখল একটা ছোট ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে একটুকরো ময়লা কাপড় জড়ানো। শীতে হিহি করে কাঁপছে।

টমাস বলল, "খোকা তুমি কি চাও ? এত রাতে এখানে এসেছ কেন ?"

ছোট ছেলেটি বলল, "আমাকে দয়া করে আজ রাতের জন্য আশ্রয় দিন। আমার মা-বাবা কেউ নেই, কোথাও থাকবার জায়গা নেই। শীতে হাত-পা জমে যাচ্ছে। আর রাস্তায় থাকতে পারছি না।"

ছেলেটাকে ঘরে এনে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল টমাস।

কিছুক্ষণ পরে ঝড়বৃষ্টি থামল। ততক্ষণে টমাস আর ছোট ছেলেটার মধ্যে বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। টমাস ছেলেটার থেকে অনেক বড়। সে ডাক্তারি পড়ে। বড়লোক। কিন্তু তার কোন অহংকার নেই। ছোট ছেলেটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল।

ছেলেটার মুখে টমাস শুনল এই শহরে ছেলেটার মত অনেক অনাথ ছেলে আছে। তারা পেট ভরে খেতে পায় না, ছেঁড়া জামা প্যাণ্ট পরে থাকে—তাদের আপনজন বলতে

কেউ নেই। তারা যদি রাস্তায় শুয়ে থাকে তবে পুলিস তাদের তাড়া করে, ছিঁচকে চোর ভেবে থানায় নিয়ে আটকে রাখে।

ছেলেটার কথা শুনে টমাস খুব অবাক্ হল। এটা লণ্ডন শহর। এখানে কত বড় বড় বাড়ি আছে, কত গাড়ি আছে, হোটেলে রেস্তোরাঁয় কত টাকা পয়সার ছড়াছড়ি—এখানে নিরাশ্রয় ছোট ছেলেরা পুলিসের ভয়ে রাত্রে লুকিয়ে থাকে, খেতে পায় না—এসব কি বিশ্বাস করা যায়?

টমাসের মনের ভাব বুঝতে পেরে ছেলেটা বলল, "আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বেশ তো—আমার সঙ্গে রাস্তায় চলুন এখনই, আমার কথা সত্যি কিনা প্রমাণ করে দেব।"

সেদিন মধ্যরাত্রে টমাস ছেলেটার সঙ্গে রাস্তায় বেরুল। ছেলেটা তাকে বাজারের দিকে নিয়ে গেল। বাজারের পেছনে মস্ত বড় লম্বা দেওয়াল। বাজারের যা কিছু আবর্জনা দেওয়ালের পেছনে ফেলা হয়। ছেলেটা দেখাল সেই আবর্জনার মধ্যে এগারজন অনাথ ছেলে ঘুমোচ্ছে। তাছাড়াও অভাগা ছেলেদের লুকিয়ে থাকার অনেক জায়গা দেখাল ছেলেটা।

ছোট ছেলেদের দুরবস্থা দেখে টমাসের খুব কষ্ট লাগল। কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায় এক বিরাট সভায় টমাস সকলের সামনে তার মধ্যরাত্রির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না। আজগুবী গল্প বলছে মনে করে অনেকে টমাসকে ঠাট্টা করল। পরদিন কাগজে একজন লিখল, টমাস গতকাল সভায় যে সব গল্প বলেছে তার সত্যতা সে কি প্রমাণ করতে পারবে?

সেদিন রাত্রে টমাস একদল গণ্যমান্য লোক নিয়ে রাস্তায় বেরুল। রাস্তার একধারে একটা ত্রিপলের নীচে ভাঙ্গা পুরানো জিনিসপত্র ঢাকা থাকত। সেই ত্রিপল তুলে টমাস সবদিকে দেখাল, ত্রিপলের নীচে ৭৩ জন অনাথ ছেলে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছে। এ ছাড়া আরও অনেক জায়গায় অনেক অনাথ ছেলেদের পাওয়া গেল।

টমাস এরপর নিজের টাকায় অনাথ ছেলেদের জন্য একটা অনাথ আশ্রম তৈরি করল। সে আশ্রমে ছেলেরা খেতে পেত, জামাপ্যাণ্ট পেত, পড়াশুনাও করতে পারত। সব খরচ দিত টমাস নিজে। সে স্থির করল তার টাকায় যত ছেলেকে আশ্রমে রাখা সম্ভব তা সে রাখবে কিন্তু কারও কাছে টাকা ধার করবে না। আশ্রমে নির্দিষ্টসংখ্যক ছেলে ভর্তি হয়ে যাবার পর যদি কেউ আশ্রয় চাইতে আসত তবে টমাস বাধ্য হয়ে টাকার অভাবে তাকে ফিরিয়ে দিত।

একদিন রাত্রে টমাস একটা ছেলেকে ফিরিয়ে দেবার সময় বলল, "আর জায়গা নেই। সীট খালি হলেই তোমাকে নেব। তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর।" সেকথা শুনে

ছেলেটা শুকনো মুখে চলে গেল। কয়েকদিন পরে টমাসের চোখে পড়ল সেই ছেলেটা রাস্তায় একটা পিপের মধ্যে মরে পড়ে আছে। খেতে না পেয়ে ছেলেটা মরে গেছে।

সেই দৃশ্য দেখে টমাস কেঁদে ফেলল। তারপর সে আর কাউকে কখনও অনাথ-আশ্রম থেকে ফিরিয়ে দেয় নি। যত টাকা লাগুক সে ধার করত। ডাক্তারি করে যা উপার্জন করত তা দিয়ে ধারের টাকা শোধ দিত। মাত্র চল্লিশ বছর টমাস বেঁচে ছিল। সেই অল্পকালের মধ্যে সে ষাট হাজার অনাথকে মানুষ করে তুলেছিল। পঞ্চাশটা অনাথ-আশ্রম গড়েছিল। ছোটদের এত বড় বন্ধু পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছে। টমাস জন বারনারডো ১৯০৫ সালে যখন মারা গেলেন তখন হাজার হাজার ছেলে তার শবযাত্রার অনুগমন করেছিল। ছোট ছেলেদের শবযাত্রার সে দৃশ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়বার দেখা যায় নি।

আবিষ্কার—

গরম দেশে আনুমানিক চল্লিশ কোটি লোক ট্রাকোমা নামক এক বিশেষ চক্ষুরোগে ভুগে থাকে। বহুলোক অন্ধ হয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এখন তাইওয়ান দ্বীপে এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার সমাপ্তির পর্যায়ে। কিন্তু আবিষ্কার যিনি করেছেন তিনি চীনা বৈজ্ঞানিক নন। একজন সাহেব।

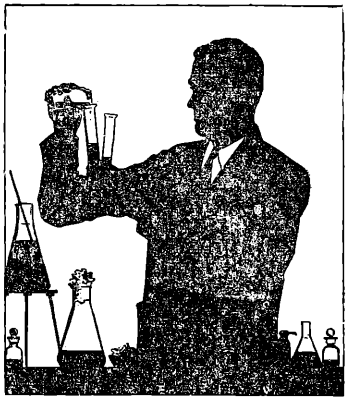

এত নুন দিচ্ছে কে

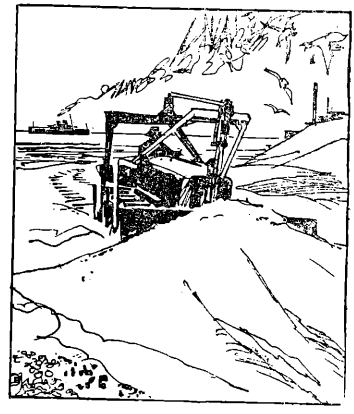

ট্রাক্টর চলছে নুনের পাহাড়ে। সমুদ্রের জল তুলে তীরবর্তী অঞ্চলে পুকুরে ভর্তি করা হয়। তারপর রোদে ও বাতাসে জল বাষ্প হয়ে গেলে নুনটা জমে পড়ে থাকে। তখন ট্রাক্টর চালিয়ে নুন খুঁড়ে তোলা হয়। এই ভাবে লক্ষ লক্ষ মন নুন প্রতি বছর তৈরী হয়ে জনসাধারণের সেবায় লাগছে।

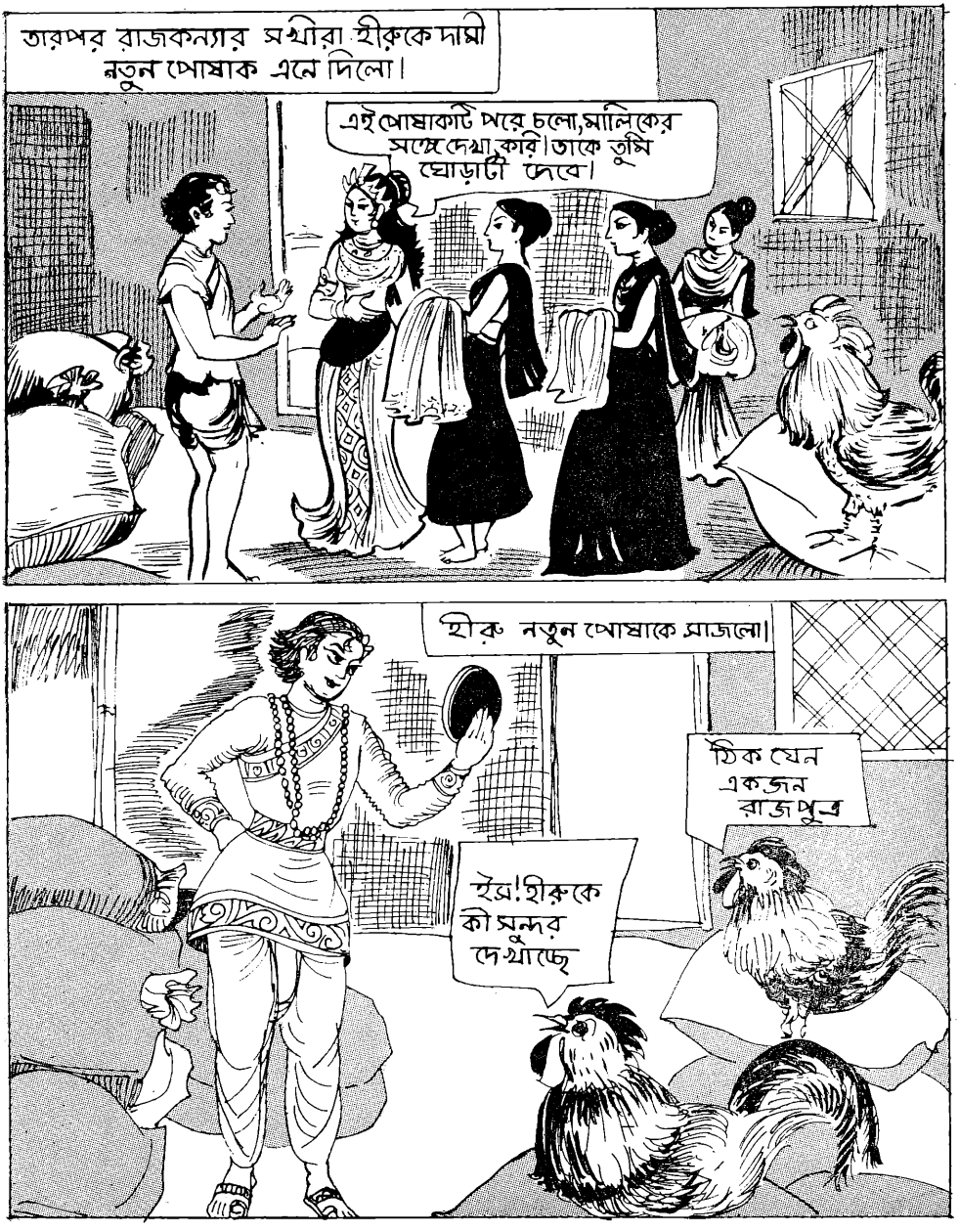
তারপর রাজকন্যার সখীরা হীরুকে দামী নতুন পোষাক এনে দিলো।
এই পোষাকটি পরে চলো,মালিকের সঙ্গে দেখা করি।তাকে তুমি ঘোড়াটি দেবে।
হীরু নতুন পোষাকে সাজলো।
ঠিক যেন একজন রাজপুত্র
ইস্স!হীরুকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে

হীরু আর রাজকন্যা কলুর ঘানি ঘরের কাছে এসে....
কর্মচারী ঘোড়াটা নিয়ে এলো।
হীরুর জন্যে যে ঘোড়া এনেছি,– সেই ঘোড়া নিয়ে এসো।
আহা! এটাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া।
কিন্তু, মহাশয় আমরাও আপনাকে সুন্দর ঘোড়া এনে দিয়েছি।
না এই ঘোড়াটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। আমি হীরুকে তেলের ঘানি দেব।

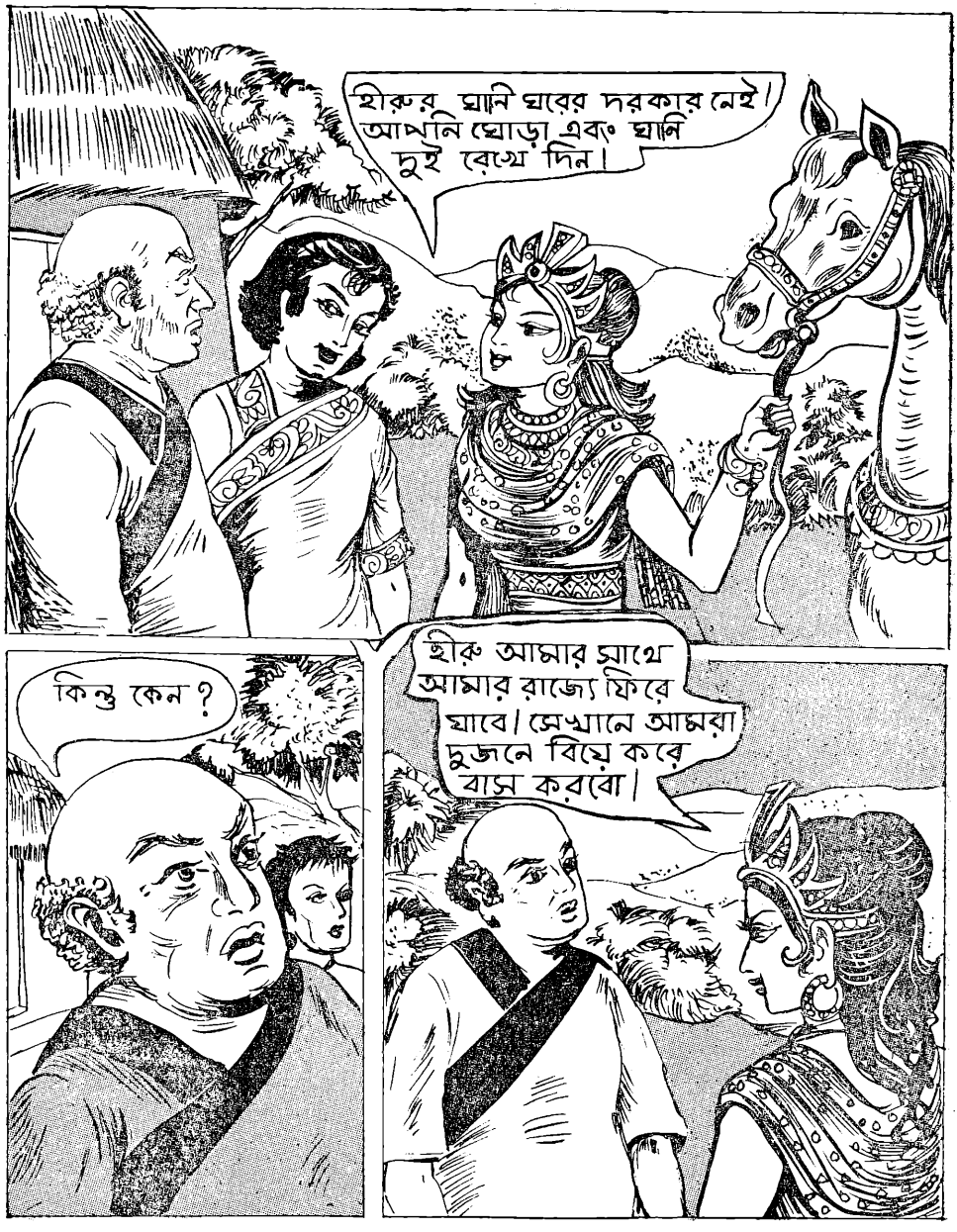
হীরুর ঘানি ঘরের দরকার নেই। আপনি ঘোড়া এবং ঘানি দুই রেখে দিন।
হীরু আমার সাথে আমার রাজ্যে ফিরে যাবে। সেখানে আমরা দুজনে বিয়ে করে বাস করবো।
কিন্তু কেন?

তারপর ওরা রথে গিয়ে উঠলো।
বিদায় মহাশয়
বিদায়

ওদের রথ রাজকন্যার রাজ্যের দিকে যাত্রা করলো।

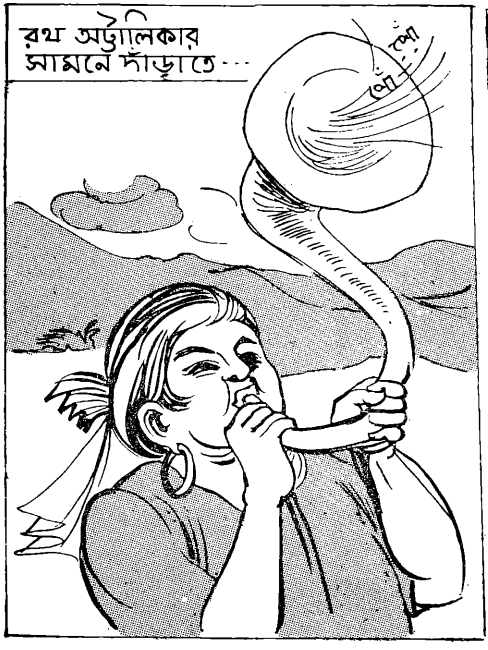

এখানে ফিরে আসতে পেরে খুব খুশী হয়েছি
রথ অট্টালিকার সামনে দাঁড়াতে···
পোঁ
পোঁ
শিঙার আওয়াজ শুনে সখীরা ফুল চন্দন নিয়ে এলো।

আমি আশীর্বাদ করছি, – তোমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রজাদের নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে রাজত্ব করো।
তারপর হীরুর সাথে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

পরের দিন....
আচ্ছা, তুমি তো আমায় বিয়ে করলে। কিন্তু আমাকে যে সকলে বোকা হীরু বলে ডাকে।
না, এবার থেকে তোমাকে সকলে রাজা-হীরু বলে ডাকবে।

শেষ

● শহীদ স্মৃতিকথা

অনন্ত লক্ষ্মণ কাহ্নেরি

রঞ্জন মিত্র

নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল গণেশ দামোদর সাভারকরের! সারা দক্ষিণ ভারত বিস্ময়ে হতবাক! এ কী কাণ্ড! গণেশ দামোদর নিছক সমাজসেবী মানুষ, বোমা পিস্তলের ধার ধারেন নি জীবনে, খুব বেশী হল তো বই লিখে গরম গরম কিছু নিন্দাবাদ প্রচার করলেন ইংরেজ শাসকদের, সেই অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর?

হ্যাঁ, ভাই বিনায়ক দামোদরের ও ঐ দণ্ডই হয়েছে। তাঁর তা হতে পারে। বিনায়ক সাভারকর সহিংস আপোষহীন বিপ্লবী বলে দুনিয়ায় বিখ্যাত, সে লোকের দ্বীপান্তর দণ্ড দিলে, অন্যায় তাতে যতই থাকুক, বিস্ময়ের কিছুই থাকত না। ইংরেজের যারা সক্রিয়ভাবে বিরোধী, তাদের ইংরেজ চরম দণ্ডই দিয়ে থাকে, এ তত্ত্ব ভূভারতে কারও অজানা নেই।

কিন্তু গণেশ দামোদর? সক্রিয় বিরোধিতা সে ভদ্রলোক কখন করলেন? তাঁকে কেন ঠেলে আন্দামান পাঠানো?

সারা দাক্ষিণাত্যে এবং উত্তরাপথেরও বহুলাংশে অসন্তোষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। এ দানবীয় অত্যাচার রুখতে হবে। এমন সাজা দিতে হবে স্বৈরাচারী ইংরেজকে যার জ্বালা সে কোনদিন ভুলবে না।

নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসন! মামলা হয়েছিল তাঁরই এজলাসে। দণ্ডাজ্ঞা তাঁরই কলম থেকে বেরিয়েছে গোড়ায়। পরে অবশ্য বোম্বাই হাইকোর্ট অনুমোদন করেছে সে-দণ্ড, কিন্তু দুর্বৃত্ত জ্যাকসনের পাপ তাতে খণ্ডায় না। বিচারাসনে বসে সে আসনের মর্যাদা রাখতে পারে নি। লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদীসুলভ দম্ভের বশে। ওকে পালটা দণ্ড দিতে হবে।

আবেগ যখন হৃদয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে, মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে ওঠে তার প্রতিক্রিয়ায়। প্রতিহিংসার উপায় উদ্ভাবনে লেগে গেল দাক্ষিণাত্যের বিপ্লবী তরুণেরা। নাসিক-কেন্দ্র স্থির করে ফেলল—মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে ঐ পামর জ্যাকসনকে। যাতে করে ইংরেজ শাসকেরা উপলব্ধি করতে পারে যে ভারতীয়দের উপরে ইট মারলে তার উত্তরে

পাটকেল খেতে হবে এখন থেকে। এক তরফা মার খাওয়ার দিন পিছনে ফেলে এসেছে ভারতবাসী।

দিতে হবে মৃত্যুদণ্ড। কী ভাবে? কে দেবে দণ্ড? যে মারবে, সে মরবে নিজেও। মরবার আগে তাকে যন্ত্রণা সইতে হবে! বর্বর, মধ্যযুগীয় যন্ত্রণা! নখের ভতর সূঁচ চালিয়ে দেবে! তপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে মাংস টেনে তুলবে বাহু থেকে, উরু থেকে! পায়ে দড়ি বেঁধে হেঁটমুণ্ডে ঝুলিয়ে দেবে কড়িকাঠ থেকে! ইংরেজের যন্ত্রণাগার সেকালের স্পেন পোর্তুগালের ইনকুইজিশনকেও হার মানিয়েছে, তা বিপ্লবীদের অজানা নেই।

যন্ত্রণা দেয় ওরা, শুধু যে ঝাল ঝাড়বার জন্য, তাও নয়। যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে বন্দীর মুখ থেকে গোপন কথা বার করে নিতে চায়। ধরা যারা পড়ে, তারা ছাড়াও আড়ালে লোক থাকে আরও। আর সাধারণতঃ মস্তিষ্কস্থানীয় লোকেরাই থাকে আড়ালে। তাদের যতক্ষণ না জালে জড়ানো যায়, ষড়যন্ত্রের জড় ততক্ষণ অটুট থাকে।

এমনও কখনো কখনো দেখা যায় যে ফাঁসিতে ঝুলতে যাদের ভয় নেই, গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগলে তারা কঁকিয়ে ওঠে। বিপদ হল এই যে আগে থাকতে বুঝবার জো নেই —এ ধরনের দুর্বলতা কার আছে, কার নেই। সেটা আগে থাকতে জেনে নিতে পারলে অনেক সুবিধে হয়। জেনে নেবার একটা চেষ্টা অন্ততঃ করবে নাসিকের এই বিদ্রোহীরা।

গভীর রাতে আড্ডাঘরে জ্বলছে একটা হারিকেন লণ্ঠন। কয়েক ঘণ্টা ধরেই জ্বলছে। কেউ একজন প্রস্তাব করলে—'এস, একে একে পরীক্ষা নেওয়া যাক, যন্ত্রণা সইবার শক্তি কার কতখানি। ঐ চিমনিটা তেতে পুড়ে আগুন হয়ে আছে, কেমন তো? দুই হাত দিয়ে ঐটে জড়িয়ে ধর দেখি! নাঙ্গা হাতে ধরতে হবে, হাতে কাপড় জড়িয়ে নয়—'

কেউ কথা বলে না। খানিকটা চুপ করে থাকবার পরে কার্ভে তর্জনী আঙ্গুলের ডগাটা ছোঁয়ালো একবার চিমনির গায়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ই-ই-স্ করে উঠে আঙ্গুলটা টেনে নিল। নিয়েই তারপর একবার হাত ঝাড়ে, একবার আঙ্গুলে ফুঁ দেয়।

আর কেউ পরীক্ষা দেবার জন্য এগুলো না।

তখন এগিয়ে গেল সেই কাহ্নেরি। গোড়ায় প্রস্তাবটা এসেছিল যার কাছ থেকে। লণ্ঠনের কাছে গিয়ে একবার পিছন পানে তাকিয়ে বলল—"দেশপাণ্ডে, তোর পকেটে ঘড়ি আছে, দেখে রাখ—"

তারপর লণ্ঠনের দিকে ফিরে দুখানা হাত বাড়িয়ে সেই আগুন চিমনিটাকে দুই দিক থেকে বেড় দিয়ে চেপে ধরল দুই হাত দিয়ে।

বন্ধুরা ছুটে গিয়ে সমুখে দাঁড়িয়েছে। একবার কাহ্নেরির হাতের দিকে তাকাচ্ছে,

একবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কপালটা কুঁচকে উঠেছে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরছে প্রাণপণে, কিন্তু মুখে কোন শব্দ নেই, হাতেও কোন নড়াচড়া নেই কাহ্নেরির।

আপনা থেকেই হাতের ঘড়ির উপরে চোখ পড়ে গেল দেশপাণ্ডের। শিউরে উঠল সে, পুরো দুই মিনিট ঐ আগুন-চিমনি জাপটে ধরে রয়েছে কাহ্নেরি।

চোখের ইশারায় বন্ধুদের বলল—"টেনে হটাও ওকে—"

দুই তিনজন পিছন থেকে কোমর জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল কাহ্নেরিকে। টানের চোটে ও যখন পিছিয়ে এল, তখন হাতের তেলো দুখানায় দগদগে পোড়া-ঘা। তেলোর চামড়া লেগে রয়েছে চিমনির গায়ে।

এ-ঘা যতদিন না সারছে, জ্যাকসনের ততদিনই পরমায়ু। বিপ্লবীরা একদিক দিয়ে নিশ্চিন্দি। যন্ত্রণা দিয়ে গোরার জাত কাহ্নেরির মুখ থেকে কথা বার করতে পারবে না। এতদিন সহিংস বিপ্লবীদের আদর্শস্থানীয় ছিল মদনলাল ধিংড়া, যে খাস লণ্ডনের বুকে দাঁড়িয়ে সামনাসামনি গুলি করে মেরেছিল কার্জন ওয়াইলিকে। তার মত সাহসী আর যে আছে কেউ ভারতীয় যুবকদের ভিতরে, এতদিন তার প্রমাণ মেলে নি। আজ মিলেছে।

ঘা শুকিয়ে এল।

এরপর কাহ্নেরিকে একবার ঔরঙ্গবাদে যেতে হল। ঐখানেই তার ঘর। আপন জনদের একবার শেষ দেখা দেখে আসা আর কি!

এই ঔরঙ্গাবাদ! বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের শেষ জীবন কেটেছিল এই শহরেরই তাম্বুতে। অবশ্য শহর ওখানে ছিল না তখন, স্থানটার নামও ছিল না ঔরঙ্গাবাদ। নামটা চালু হয়েছিল ঔরঙ্গজেব ওখানে এসে ছাউনি ফেলবার পরে।

কাহ্নেরির মত ঔরঙ্গাবাদী যুবকদের একদা মনে হয়েছিল—ইংরেজের স্বৈর-শাসনের তুলনায় বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের শাসনও বুঝি ভাল ছিল ভারতের পক্ষে। হিন্দুর উপরে অত্যাচার যতই করুন তিনি, ভারতের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে ভারতের বাইরে তিনি পাঠান নি। পাঠাবার মত অন্য দেশ তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন ভারতেরই সন্তান, ভারতবাসী।

কিন্তু এই ইংরেজ? সাত-সমুদ্র পারের একান্ত অনাত্মীয়। এরা এসেছে শুধু ভারতকে শোষণ করতেই। এদের শোষণ বন্ধ করার কি উপায় নেই কিছু?

ঔরঙ্গজেবের নিষ্পেষণকে যারা রুখেছিল, তারা কি ইংরেজের রক্তচক্ষুকে ডরাবে? ভারতবর্ষ। মহারাষ্ট্রে শিবাজী, রাজস্থানে রাজসিংহ দুর্গাদাস, বুন্দেলখণ্ডে ছত্রশাল, ভরতপুরে জাঠ চূড়ামন। নবভারত গঠনের জন্য জীবন পণ করেছিলেন।

কাহ্নেরি আর তার বন্ধুরাও তো তা করতে পারে।

ওদের দুই দিনের জল্পনার ফলে জন্মগ্রহণ করল নতুন এক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান—"অভিনব ভারত"। দেখতে দেখতে এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ল সারা দক্ষিণদেশে। বাদ গেল না নাসিকও।

নাসিকের কৃষ্ণগোপাল কার্ভে কলকাতা থেকে বোমা বানানো শিখে এসেছিল, কখনো কিনে, কখনো বা কেড়ে নিয়ে, গোটাকতক পিস্তলও সে করেছিল সংগ্রহ। জ্যাকসন-হত্যার তোড়জোড় এই পর্যন্ত এসেই থেমে ছিল, কারণ আসল জিনিসই তারা পারছিল না যোগাড় করতে। সেই জিনিসটি হল—মদন ধিংড়ার সমগোত্র একটা মানুষ।

এই সময় কাহ্নেরি এল অভিনব ভারতের শাখা কার্যালয়টা দেখবার জন্য। কার্ভেরা তাকে আটক করল—"আমাদের এই ক্ষুদ্র কর্মটি উদ্ধার করে দিয়ে যাও। কী করে জ্যাকসনকে ভবপারে পাঠানো যায়। তারই উপায় বাৎলে দিয়ে যাও একটা—"

কাহ্নেরি ভার নিল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল—'পিস্তল চালানোটা আমি ভাল করে রপ্ত করতে পারিনি। পিস্তল যোগাড় হয় তো সময় পাই না, আবার সময় যখন হাতে থাকে, তখন পিস্তল পাই না হাতের নাগালে। জ্যাকসনের ব্যাপারে গুলি তো ফসকালে চলবে না বন্ধু! অতএব সর্বপ্রথমে আমার দরকার—পিস্তলে হাত পাকানো—'

দেশপাণ্ডে ছিল পঞ্চবটী স্কুলের শিক্ষক। স্কুলবাড়িতেই তার বাসস্থান। আরও সুবিধা, স্কুলবাড়িতে রাত্রে অন্য লোক তো থাকেই না কেউ, তার ধারে কাছেও অন্য কোন লোকালয় নেই।

দেশপাণ্ডে সেইখানে নিয়ে গেল কাহ্নেরিকে। দরজা-জানালা বন্ধ করে সেখানে তাকে সারা রাত পিস্তল চালনা শেখাল কৃষ্ণগোপাল কার্ভে!

১৯০৯ সাল, ২০শে ডিসেম্বর।

কাহ্নেরিকে ওরা নিয়ে গেল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। জ্যাকসনের মূর্তিটা ভাল করে চেনাবার জন্য। তা সে চিনল ঠিকই। কিন্তু একটা খবর পেয়ে দুশ্চিন্তাতেও পড়ে গেল একটু। জ্যাকসন নাসিক থেকে চলে যাচ্ছে। পুনায়ও বদলি হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আঁচ পেয়েছে যে বিপ্লবীরা পিছনে লেগেছে জ্যাকসনের, তাই নিরাপদ দূরত্বে ওকে সরিয়ে নিতে চায়।

মাত্র ডিসেম্বর মাসটা হাতে আছে এদের। ৩১শে ডিসেম্বর শিকার অন্য অরণ্যে পালাবে। যা করবার, অবিলম্বে করা চাই।

অবিলম্বে কিছু একটা করে ফেলবার সুযোগও বুঝি আসছে। নাসিকের নাগরিক-সমাজে খয়ের খাঁ রাজভক্তের দল নগণ্য নয়। তারা সমারোহ করে বিদায়-সংবর্ধনা

জানাতে চাইছে জ্যাকসনকে। সেই উপলক্ষে বিজয়ানন্দ থিয়েটারে অভিনয়ও হবে একটা। তার তারিখ হল আগামী কাল, ২১শে ডিসেম্বর।

ভালই। শুভস্য শীঘ্রং। কালই তা হলে হয়ে যাক। দেশপাণ্ডের বাড়িতে গিয়ে কাহেরি অস্ত্র নিয়ে এল। একটা ক্রাউনিং পিস্তল, আর একটা নিকেল-মাড় রিভলবার। এক প্যাকেট আর্সেনিকও রইল কাহেরির পকেটে। ধরা পড়লেই টুক করে খেয়ে নেবে। যন্ত্রণা সইবার শক্তি আছে বলেই যে তা শখ করে সইতে হবে, এমন কোন কথা নেই। সুযোগ হলে অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা।

কাজ সমাধা করতে হবে থিয়েটার বাড়ির প্রেক্ষাগারে। সেখানে ঢুকবার জন্য দুখানা টিকিট কেনা হল। দলের আরও দুই তিনজন পৃথক্ ভাবে প্রবেশ করেছে ওখানে। আসল কাজের ভার কাহেরির উপরে। সে পিট-এর কোণে আসন নিয়েছে। তারপরে দশ বারোখানা আসন বাদ দিয়ে বসেছে দেশপাণ্ডে।

প্রথম গুলি কাহেরি করবে। সে যদি ব্যর্থ হয়, তখন দেশপাণ্ডে চালাবে গুলি। সেও যদি কাজ শেষ করতে না পারে, তখন কার্ভে প্রভৃতি আরও যারা আছে প্রেক্ষাগারে, যে যেমন পারে, চেষ্টা করবে দুশমনটাকে খতম করবার। মোট কথা, কোনমতেই যেন জ্যাকসন প্রাণ নিয়ে থিয়েটার থেকে বেরুতে সক্ষম না হয়। তাতে যত বিপ্লবীকেই মৃত্যুবরণ করতে হোক, আপত্তি নেই তাতে।

নাসিকের গণ্যমান্য রাজভক্তদের সাদর আমন্ত্রণে জ্যাকসন বুটের ধুলি দিতে এসেছেন বিজয়ানন্দ রঙ্গমঞ্চে। তাঁর জন্য আসন সুসজ্জিত রয়েছে অর্কেস্ট্রায়। সেখানে পৌঁছোতে হবে পিটের পাশ দিয়ে। আর পিট-এর কোণেই বসে আছে কাহেরি। জ্যাকসন চলে যাচ্ছেন, যেন তাঁকে সম্ভ্রম দেখাবার জন্যই কাহেরি উঠে দাঁড়াল, এগিয়েও এল একেবারে কাছে।

তারপরই একটা জোর বিস্ফোরণ। সবাই ভাবল—বাইরে কোন স্ফূর্তিবাজ বালক পটকা ফুটিয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। ওটা কাহেরিরই পিস্তলের শব্দ। প্রথম গুলিটা কিন্তু লাগল না, ওটা পিছলে বেরিয়ে গিয়েছে জ্যাকসনের বগলের নীচ দিয়ে।

দ্বিতীয় গুলিটা ঠিকই লাগল কাঁধে। জ্যাকসন পড়ে গেল। আর তার ধরাশায়ী দেহের পাশেই দাঁড়িয়ে গুলির উপরে গুলিবর্ষণ করে চলল কাহেরি। দেহটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল একেবারে বুলেটে বুলেটে।

জনারণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই কাণ্ড। জ্যাকসনের দেহরক্ষীরা পিছনেই ছিল। পিছন থেকে তারা কাহেরীকে জাপটে ধরল এইবার। পকেটে আর্সেনিক। কিন্তু পকেটে হাত দেওয়ার ফুরসুৎ তার কই? সে তো তখনও গুলিই চালিয়ে যাচ্ছে জ্যাকসনের দেহটার উপরে। যদিও দেহ থেকে প্রাণপাখী কখন ইতিমধ্যে উড়ে পালিয়েছে।

কাহ্নেরি ধরা পড়ল। কিন্তু তার মুখ থেকে শত যন্ত্রণা দিয়ে কোন গোপন কথাই বার করতে পারল না পুলিস। তবে কথা হল এই যে পুলিসকে সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, খবর দেবার লোক অনেক আছে। কাহ্নেরি যে দেশপাণ্ডে, কার্ভেদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত, এ-কথা পুলিসের কানে গেল এবং পুলিস ২৪শে ডিসেম্বর গ্রেফতার করল দেশপাণ্ডেকে।

তারপর একে একে কার্ভে এবং আরও তিনজনকে ধরল ওরা। বিচার শুরু হল ১৯১০-এর ১৪ই জানুয়ারি। সেখান থেকে মামলা গেল হাইকোর্টে। অপরাধ তো স্বীকার করলই বন্দীরা। পরন্তু অপরাধটাকে অপরাধ বলেই মেনে নিতে রাজী হল না। "ঠিকই করেছি। ছাড়া পেলে আবারও করব। এক জ্যাকসন গিয়েছে। হাজার জ্যাকসন সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের খতম করবার জন্য প্রত্যেকটা বিপ্লবীর দশটা করে জীবন থাকা দরকার।"

বিচারে কাহ্নেরি, দেশপাণ্ডে ও কার্ভের হল প্রাণদণ্ডের আদেশ, অন্য তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের।

কাহ্নেরি, দেশপাণ্ডে, কার্ভের ফাঁসি হয়ে গেল বোম্বের উপকণ্ঠে থানা স্পেশাল জেলের ভিতর। ১৯১০-এর ১৯শে এপ্রিল, সকাল ৭টায়।

ছবিতে কি ভুল আছে বল তো ?

প্রশ্ন—

এই ছবি গুলিতে কোথায় কি ভুল আছে বল তো ঃ

না পারলে ২০১ পৃষ্ঠায় দেখ।

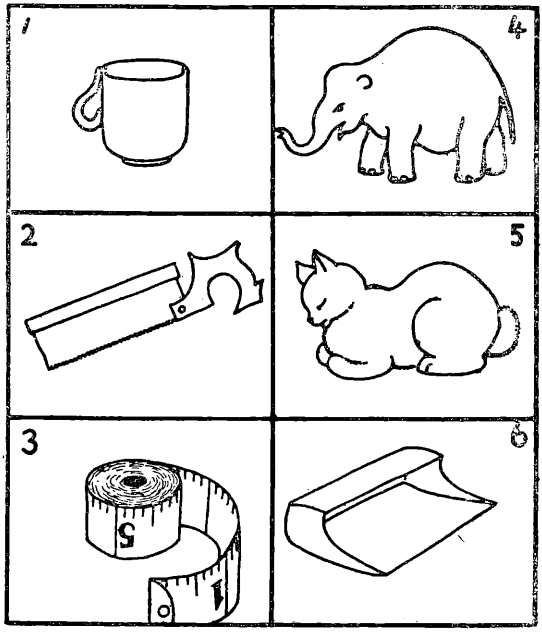

সব্যসাচী

১

হরিণটা জল খাবে।

জন্তুজানোয়ারের পায়ে পায়ে এই পাহাড়ঘেরা হাওড়ের ধারে সুপরিসর পথ পড়ে গিয়েছে একটা। তারই শেষ মাথায় পৌঁছে জলে মুখ দিতে যাচ্ছে ভীতু জন্তুটা, তার আগে একবার মাথাটা ঘোরাল। প্রথমে ডাইনে, তারপর বাঁয়ে। ডাইনের দিকটা নিরাপদই মনে হল বেচারীর, কিন্তু বাঁয়ে—

বাঁয়ে এক পলক দেখে নিয়েই হরিণ তীরবেগে উঠে পড়ল ডাঙ্গায়, লম্বা ঘাসের ঝোপ গজিয়েছে জলের কিনারে কিনারে, এক লহমায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল তারই ভিতরে। জল খাওয়া মাথায় থাকুক। প্রাণটা যে বেঁচে গেল তার, এইটাই মস্ত লাভ।

প্রাণ যে শুধু তারই বাঁচল এই আচমকা পলায়নের দরুন, তাও নয়। বাঁচল আরও একজনের।

সেই একজন হল টারজন।

উপত্যকাটা ছোট-বড় পাথরের চাঙ্গড়ে চাঙ্গড়ে আকণ্ঠ ভরা। তাদেরই ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে বুকে হেঁটে হেঁটে টারজান এগুচ্ছিল হরিণটার দিকে। উঠে দাঁড়াতে সাহস করে নি, ভয় ছিল যে তাহলে সদাসতর্ক হরিণের নজর সে এড়াতে পারবে না। এমনিধারা কনুই আর হাঁটুর উপর ভার রেখে বুকে সরে সরে শিকারের দিকে এগিয়ে থাকে অরণ্য-রাজ্যের সেরা শিকারী শীটা অর্থাৎ চিতাবাঘ। টারজানের নিজস্ব ভাষায় সব জন্তুরই এক একটা বিশেষ নাম আছে, এই শীটা নাম তারই দেওয়া।

হ্যাঁ, টারজান এগুচ্ছিল। বল্লমের পাল্লার ভিতর এনেও প্রায় ফেলেছিল হরিণটাকে। জল খেতে শুরু করার আগে প্রাণীটা যদি না তাকাত এদিকে ওদিকে, এতক্ষণ টারজানের বেঁটে বল্লমের মোক্ষম আঘাতে ছটফটিয়ে সে পড়ে যেত আধেক জলে আধেক ডাঙ্গায়—

কিন্তু তাকিয়ে সে দেখেছে এবং তীরবেগে পালিয়েছে তৎক্ষণাৎ।

টারজান অবাক্। কেন পালাল হরিণ? নিশ্চয়ই টারজানকে দেখে নয়। যেভাবে টারজান এগুচ্ছিল তাতে তাকে দেখতে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল হরিণের পক্ষে। আর গন্ধ? তাও তো পায়নি জন্তুটা। পেতে পারেই না, কারণ হাওয়া বইছিল জলের দিক্ থেকে পাহাড়ের দিকে। অর্থাৎ হরিণের গন্ধ টারজানের নাকে ঢুকছিল, টারজানের গায়ের গন্ধ হরিণের দিকে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

তবে কী হল ব্যাপারটা?

চকিতের ভিতর টারজানও তাকাল ডাইনে বাঁয়ে। চকিতের ভিতর সে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছে, এবং এটাও ঠিক যে আরণ্য পরিবেশ সম্বন্ধে টারজানের সিদ্ধান্ত কোনদিন ভুল বলে প্রতিপন্ন হয় নি এ-যাবৎ।

টারজান সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই রকম যে গন্ধটন্ধ নয়, চাক্ষুষ কিছু দেখেছিল হরিণটা বাঁয়ের দিকে। এখন বাঁয়ের দিকে তাকানো মাত্র সে নিজেও দেখল সেই ভয়ের বস্তুটা। দেখা মাত্রা সেও হরিণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। তীরবেগে ছিটকে গিয়ে পড়ল একটা বড় চাঙড়ের আড়ালে। আর আড়ালে আড়ালেই কুঁজো হয়ে দৌড়ে গিয়ে পড়ল সেই ঘাসের বনে, এইমাত্র হরিণও আশ্রয় নিয়েছে যার ভিতরে।

টারজানও ছিটকে পড়ল, বুম বুম শব্দে কয়েকটা রাইফেলের গুলিও এসে আছড়ে পড়ল সেই চাঙড়টার ওপিঠে।

শিফ্‌টা! হরিণকে তারা দেখেনি, তাদের লক্ষ্য গোড়া থেকেই ছিল টারজানের দিকে। পাহাড়ের উপর থেকে ওকে দেখে তারা নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছে রাইফেলের পাল্লার ভিতর পৌঁছোবার জন্য। পৌঁছেও গিয়েছিল। আর কয়েক সেকেণ্ড সময় যদি তারা পেত—

পেত যদি, বনের রাজা টারজানের জীবনকথায় ইতি টানতে হত তৎক্ষণাৎ। কারণ টারজান ঘুণাক্ষরেও ওদের অস্তিত্বের কথা জানতে পারে নি। তাকায় নি ওদিকে। ওর নজর বরাবর ছিল হরিণটার দিকে কারণ সে ক্ষুধার্ত।

তাকায় নি তো বটেই, গন্ধও পায় নি। যে-কারণে হরিণ পায় নি গন্ধ, টারজানও পায় নি সেই কারণেই। বাতাস উলটো বইছে।

হ্যাঁ, বড় ফাঁড়া কাটিয়েছে আজ টারজান। দৈবাৎ। যে হরিণের মাংসে সে ক্ষুন্নিবৃত্তির মতলব আঁটছিল, সেই নিমিত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রাণরক্ষার প্রাণরক্ষা! হ্যাঁ, তা আপাততঃ

প্রাণটা রক্ষা পেয়েছে বটে, কিন্তু শেষরক্ষা হবে তো? শিফ্‌টার দল পাহাড় বেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নামছে। কী তাজ্জব চীজ ঐ ঘোড়াগুলো! বুনো ছাগলের মতই পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘোরে, কোনদিন পা ফসকায় না।

পাহাড় থেকে উপত্যকায় পড়ল শিফ্‌টারা। টারজানকে শেষ করাই তাদের মতলব। হাবশি মুলুকের অভিশাপ এই শিফ্‌টা দস্যুরা। সমাজ থেকে পলাতক, বনে জঙ্গলে অধিত্যকায় ও উপত্যকায় ওদের ডেরা, নরঘাতক, নির্মম, বেপরোয়া। জনে জনে ওদের মাথার উপরে পাঁচ দশ হাজার ড্রাক্‌মা মূল্য ধার্য আছে হাবশি সরকারের তরফ থেকে।

কাফ্‌-অঞ্চলের উত্তরের এই পাহাড়, এবং এরও উত্তরে বহু বহু বিস্তীর্ণ দুরধিগম্য পার্বত্য প্রদেশ। এটাকে মোটামুটি এই শিফ্‌টা দস্যুদেরই রাজ্য বলা চলে। কত শত দস্যু যে আছে এখানে, তার হিসেব কেউ জানে না। অবশ্য সবাই তারা এক দলের লোক নয়। পঞ্চাশ ষাট জনের বেশী শিফ্‌টার পক্ষে এক সাথে থাকা সম্ভব হয় না। প্রধান অসুবিধা খাদ্যের। পশুমাংস ছাড়া অন্য কিছু খাবার তো মেলে না এই পাহাড় জঙ্গলে। তা হাজার দুই হাজার লোক একত্র বসবাস করে যদি, তাহলে তো খাদ্যের সন্ধানেই তাদের ক্রমাগত ব্যস্ত থাকতে হয়, সারা দেশটা চক্কোর দিয়ে দিয়েই ঘুরতে হয় মাংসের খোঁজে।

তাই একসাথে বেশী লোক থাকে না। ঐ পঞ্চাশ ষাট জন। ঘন বর্ষায়, এই ধর জুন থেকে সেপ্টেম্বর এখানে চলে বর্ষার তাণ্ডব। ঢল নামে আমহারা আর টিগ্‌রে পাহাড়ের গা বেয়ে। ভেসে যায় গোজাম, শোয়া আর কাফা। সেখানকার পলিমাটি ধুয়ে নিয়ে নামিয়ে দেয় পূর্ব মিশরে আর সুদানে। সোনার ফসলে সে সব দেশ হেসে উঠে পরের মরসুমে।

তা, মিশর-সুদানের পক্ষে যা হল প্রকৃতির আশীর্বাদ, উত্তর আবিসিনিয়ার বনবাসী শিফ্‌টাদের পক্ষে তাই হল মর্মান্তিক অভিশাপ। বর্ষার চার মাস খাদ্য জোটানো তাদের ভারী মুশকিল। অগত্যা তারা দিকে দিকে ছুটে বেরোয় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। যুগপৎ মৃগয়া চলে অনেক অরণ্যে।

আজ যে দলটা কোহেটুং উপত্যকায় দেখতে পেয়েছে টারজানকে, তারা এই রকমই ছোট দল একটা। সাকুল্যে ছয়জন লোক দলে।

পাহাড় থেকে নেমে এরা এসে পড়েছে উপত্যকায়। এলোপাতাড়ি গুলি চালাচ্ছে ঘাসবন লক্ষ্য করে। চোখে না দেখলেও অনুমান ঠিকই করেছে তারা যে ঐ বনেই আশ্রয় নিয়েছে তাদের দুশমন।

দুশমন? টারজান তাদের অপরিচিত লোক, তাকে তারা হঠাৎ দুশমন বিবেচনা করে কেন?

এ প্রশ্নের অতি সহজ উত্তরই আছে একটা। তা এই যে সমাজ-বিরোধী এই দুর্বৃত্ত দস্যুরা নিজেদের দলের লোক ছাড়া অন্য সবাইকে দুশমন মনে করে। "যে আমাদের সঙ্গে নয়, সে আমাদের বিরুদ্ধে"—এই নীতি নিয়েই তারা জীবনধারণ করে।

তা ছাড়াও, যে আমাদের সঙ্গে নয়, সে সরকারের চর হতে পারে। গোয়েন্দাগিরি বিরল যদিও এদেশে, তার সম্ভাব্যতা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং সম্ভাব্য শত্রুকে দর্শনমাত্র শেষ করে দাও।

প্রথম তীরটা আমূল বিঁধে গেল দস্যুনেতার বুকে।
[পৃষ্ঠা ১৯৮

শেষ করে দেবার জন্যই তারা আজ ধাওয়া করেছে টারজানের পিছনে। নইলে, ওকে মেরে মুনাফা কিছু হবে না, তা তো এক নজরেই ওরা বুঝে নিয়েছে। গায়ে ওর বসনের লেশমাত্র নেই। কটিতে একটুকরো মাত্র চামড়া আছে মনে হল। তা ছাড়া, অস্ত্র? বেঁটে বল্লম একখানা, আর ধনুক একটা, তাও বেদম ছোট। ও দিয়ে কি কাজ হবে শিফ্‌টাদের? তীর ধনুকের চাইতে ঢের উঁচু দরের জিনিস আছে তাদের, রাইফেল। আর ধনুক থেকে তীর ছোঁড়ার কসরৎ শিফ্‌টাদের বাপ দাদারা এককালে জানত অবশ্য, এ যুগের এদের কাছে তা অজ্ঞাত।

সুতরাং, কোন লাভের প্রত্যাশা না রেখেই ওরা টারজানকে শেষ করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। নিতান্তই নিষ্কাম কর্মযোগী এরা।

গুলিবৃষ্টি ছয়-ছয়টা রাইফেল থেকে। এভাবে চলতে থাকলে টারজান যে ঘায়েল হবে না এক সময়ে, এ-আশা টারজানের মত দুরন্ত আশাবাদীও করতে পারে না। সুতরাং টারজানকেও সক্রিয় হতে হয় এবারে। তীরের পাল্লায় ভিতরে এসেও পড়ছে দস্যুরা।

এই যে টারজানের পিঠে ধনুকখানি, দুনিয়ায় এ-রকম আর একখানি ধনুক কারও নেই। মানে, এমন খাটো আর এমন মোটা। খাটো করতে হয়েছে এই জন্য যে নিবিড় বনের

ভিতরে লম্বা ধনুক নিয়ে চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। আর মোটা? মোটা না করলে তো মড়াৎ করে ভেঙে যাবে টারজানের পহেলা টানেই।

অতি সাবধানে টারজান উঠে বসল ঘাসবনের ভিতরে। পিঠ থেকে ধনুক নিয়ে ছিলায় তীর পরাল। ছয়টা শিফ্‌টা ততক্ষণে লক্ষ্য করেছে ঘাসবনের ভিতরকার মৃদ কাঁপুনিটা। যত সাবধানই হোক টারজান, তার নড়াচড়ায় একটুও নড়বে না ঘাস, তাও কি হয় নাকি কখনো?

ঘাসের কাঁপুনি দেখে সেই দিকে রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে দস্যুরা। এদিকে সেই মোটা ধনুক থেকে শুরু হয়েছে শরবৃষ্টি। প্রথম তীরটা আমূল বিঁধে গেল দস্যুনেতার বুকে। দলটার পুরোভাগে ঘোড়ার পিঠে বসে যে গুলি চালাচ্ছিল। তীর বিঁধতেই সে উলটে পড়ে গেল মাটিতে, তার সাথীরা এক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল এই আকস্মিক বিপর্যয়ে।

আর সেই এক মুহূর্তের হকচকানিতেই ঘটে গেল তাদের সর্বনাশ। সাঁ সাঁ শব্দে তীর আসছে ক্রমাগত। একটার পর আর একটা। অথবা বলা যেতে পারে একটার সঙ্গে আর একটা। চোখের পলক পড়তে যেটুকু দেরি হয়, একটা নতুন তীর ছুড়তে ততটুকু দেরিও হয় না টারজানের।

পর পর তিনটে তীরে ঘায়েল হল তিনটি দস্যু। তবে দলনেতার মত 'পপাত চ মমার চ' ঘটল না এদের ভাগ্যে। এরা হল আহত। দু'জন গুরুতর ভাবেই, তারা পড়ে গেল মাটিতে, আর একজন আহত হল উরুতে, সে কোনমতে বসে রইল ঘোড়ার পিঠে। যে-দু'টি লোক অক্ষত রয়েছে, তারা সমুখে এগুবার চেষ্টা আর করল না, কারণ তাতে মৃত্যু যে অবধারিত, তা তারা হৃদয়ঙ্গম করেছে এতক্ষণে।

এগুলো না, তবে পিছুও হটল না। কারণ হটলেও তীরের হাত থেকে রেহাই না মিলতে পারে। পৃষ্ঠপ্রদর্শনে একমাত্র ফায়দা এই হতে পারে যে তীর বুকে না বিঁধে বিঁধবে হয়ত পিঠে। তা পিঠও এমন কিছু অবহেলার বস্তু নয় মানুষের পক্ষে, সেটাকেও তীরের ঘা থেকে বাঁচাবার চেষ্টাই করে বুদ্ধিমান লোকে।

অতএব তারা এগুলো না, পিছোলো না, যেখানে ছিল রইল সেখানেই। তবে ঘোড়ার পিঠে রইল না আর, সড়াৎ করে নেমে পড়ল মাটিতে, এবং আশ্রয় নিল ঘোড়ারই লেজের পিছনে। যত চোখা তীরই হানুক ঐ অজানা দুশমন, তা কিছু আর ঘোড়াটাকে এফোঁড় ওফোঁড় বিদ্ধ করে আবার বেরিয়ে যেতে পারবে না পশ্চাৎবর্তী সওয়ারকে জখম করবার জন্য।

একটা মাত্র লোক, উরুতে যার তীর বিঁধেছিল, মরিয়া লোক তাকে বলতেই হবে। সে

আহত হয়েও ক্ষান্ত হল না। ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চলল ঘাসবনের দিকে। পর পর চারটি তীর ছুড়েছে টারজান, শত্রুদলকে ছত্রভঙ্গ দেখে সে একটু বিরাম দিয়েছে শরবৃষ্টিতে, পর্যবেক্ষণ করছে রণস্থলের অবস্থাটা।

টারজান নড়ে না চড়ে না, ঘাসবনও নিশ্চল কাজে কাজেই। ছুটন্ত সওয়ার বুঝতে পারে না কোন্ দিকে রাইফেল তাক করবে। ছুটতে ছুটতেই সে এদিক ওদিক দৃষ্টিসঞ্চালন করছে, কোথাও একটু কাঁপুনি দেখা গেলে অমনি তীর হাঁকাবে তক্ষুণি।

ছুটন্ত সওয়ার মাত্র একটাই এই মুহূর্তে, কিন্তু ছুটন্ত ঘোড়ার সংখ্যা দুই। দলনেতা যখন ঘোড়া থেকে ধরাশায়ী হল গতপ্রাণ অবস্থায়, তার ঘোড়াটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল একটুখানি, তারপরই নিজের মর্জিমত ছুটতে লাগল ঘাসবনের দিকেই। বস্তুতঃ ছুটন্ত অশ্বযুগলের মধ্যে এই সওয়ারহীন জন্তুটাই চলেছে আগে আগে, কারণ পিঠ তার খালি, বোঝা বইবার ঝক্কি তার নেই।

নেই, মানে ছিল না। কিন্তু বোঝা জুটে যেতেও হল না দেরি। ঘাসবনে সে ঢুকে পড়ল যখন, বেশ খানিকটা দূর চলেই গিয়েছে যখন ঘাসবন মাড়িয়ে মাড়িয়ে, হঠাৎ তার পাশ থেকে একটা প্রায় নিরাবরণ শ্বেত দৈত্য লাফিয়ে উঠল ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে, আর চেপে বসল তার পিঠে। ভয় পেয়েই হোক আর ক্রোধের বশেই হোক, ঘোড়াটা দৌড়ের বেগ বাড়িয়ে দিল অনেকখানি।

দুটো ঘোড়া ছুটেছে এবার, একটার পিছনে আর একটা। টারজানের ঘোড়া আগে আগে, শিফ্‌টা দস্যুটার ঘোড়া তার পিছনে। ছুটতে ছুটতে গুলি চালালে সে-গুলি কদাচিৎই লক্ষ্যভেদে সক্ষম হয়। শিফ্‌টা বেশ কয়েকবারই সে চেষ্টা করল বইকি, ব্যর্থও হল প্রতিবার।

শিফ্‌টারা যেদিক দিয়ে এসেছিল, স্বভাবতঃই টারজান চলেছে তার উলটো দিকে। বাঁয়ে রয়েছে সেই হাওড়, সামনে এবং ডাইনে এখনও বুকসমান ঘাসের বন। তবে অদূরে নিবিড় অরণ্যও একটা দেখা যায় তৃণভূমির ও প্রান্তে।

প্রান্তে পৌঁছোতে বেশীক্ষণ লাগল না, আর পৌঁছেই দেখতে পেল টারজান এক মস্ত নদী। বিপুল তার বিস্তার, প্রচণ্ড তার স্রোত। কালো জলের ঐ যে হাওড়টা স্থির বিভীষিকার মত নিঃসাড়ে পড়ে আছে টারজানের বাঁয়ে, ওটা এই নদীরই কোন পুরানো খাতের আটকে পড়া সলিল-সন্তার ছাড়া আর কিছু নয়।

নদী প্রশস্ত, খরস্রোতা, তাতে ভুল নেই, কিন্তু ঐ নদীতেই ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া গতি কি আছে টারজানের? ঠিক পিছনেই ধেয়ে আসছে একটা শিফটা। আরও দুটো শিফটা যে অক্ষত আছে এখনও, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। এখন তারা প্রাণভয়ে ঘোড়ার আড়ালে

লুকিয়েছে বটে, কিন্তু ভয় এক সময় কাটবে। তাদেরই অন্যতম সাথী বীরবিক্রমে পশ্চাদ্ধাবন করেছে দুশমনের, এ দেখেও কি বিলুপ্ত সাহস ফিরে আসবে না তাদের ?

আসে যদি, তিনটি রাইফেলধারীর সঙ্গে তীরধনুক সম্বল টারজানের লড়াই বাধে যদি সামনাসামনি, সেটাকে অসম যুদ্ধই বলতে হবে। একটু আগে যে লড়াই হয়ে গেল, সেটা দ্বিগুণ অসম ছিল, তা খুবই ঠিক। এখন শত্রুরা তিনজন মোটে, তখন ছিল ছয়জন। কিন্তু ভুললে চলবে না, তখন টারজানের হঠাৎ আবির্ভাবের চমক তারা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কিংকর্তব্য স্থির করে ওঠার আগেই তাদের তিনজন ধরাশয্যা গ্রহণ করেছে। এখন অবস্থা তা নয়। শত্রুর প্রকৃতি এবং শক্তি সম্বন্ধে ওরা এখন ওয়াকিবহাল। তীর মারাত্মক অস্ত্র বটে, কিন্তু রাইফেল আরও মারাত্মক। সেকথা কি আর জানে না তারা ? আঁটঘাট বেঁধে তিনজন ওরা যদি বুলেট বৃষ্টি শুরু করে, তখন ?

ঘাসের বন ছেড়ে এসেছে টারজান। নদীর এপারে আর আচ্ছাদন নেই কোন। তীরের পাল্লার চেয়ে রাইফেলের পাল্লা দ্বিগুণ। এই পরিস্থিতিতে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে যাওয়া টারজানের পক্ষে চরম গোঁয়ার্তুমি হবে !

যুদ্ধ যদি না করতে হয়, পালাবার পথ ঐ নদী। স্রোত প্রচণ্ড, টারজানের শক্তিও প্রচণ্ড। সাঁতরে ও অনায়াসে পেরিয়ে যেতে পারবে এ-নদী। তার তাকেই বা এক্ষুনি কেন দিতে হবে সাঁতার ? ঘোড়াটা রয়েছে কী করতে ? ঘোড়ায়াও চমৎকার সাঁতারু। টারজানকে পিঠে নিয়েও ও পারবে সাঁতার দিতে। অন্ততঃ কিছু দূর পর্যন্ত তো পারবেই। যখন পারবে না, তখন ওকে ছেড়ে দিয়ে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করবে টারজান।

ঝপাং ! নদীতে লাফিয়ে পড়ল টারজানের ঘোড়া। তার আগে একবার পিছন দিকে তাকিয়ে নিয়েছে টারজান। পিছনে শিফ্‌টা এখনও তিনটাই বটে। টারজানের অনুমানে ভুল হয় নি কিছু। ঘোড়ার লেজের আশ্রয় ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে আবার সওয়ার হয়েছে পশ্চাদ্বর্তী যুগল শিফ্‌টা। আসছে তারা, তবে এখনও অনেকটা দূরে আছে।

কিন্তু আগে থেকে যে দুশমন ছিনে জোঁকের মত লেগে আছে সঙ্গে, সে এসে গিয়েছে খুবই কাছে। নদীর কূলে সে দুই মিনিটেই পৌঁছে যাবে। দাঁড়িয়ে পড়ে ধীরে সুস্থে তাক করবে টারজানকে। অবশ্য টারজানের গতি যে সরলরেখাতেই চলতে থাকবে নদীর ভিতর, তার কোন কথা নেই। স্রোতের বেগে সে কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে, ভেসে ভেসে যাবেই ঘোড়াসমেত। তাক ঠিক করার পক্ষে শিফ্‌টা বাবাজীর এখনও কিছু অসুবিধে ঘটতে থাকবেই। আর সেই অসুবিধাটুকুর উপরেই যা-কিছু ভরসা টারজানের নিরাপত্তার !

যা হোক, অগাধ জলে এসে পড়েছে টারজান। ঘোড়াটা সাঁতার দিচ্ছে তোফা। ঢেউ ভাঙ্গছে, টারজানের মাথার সামনে উঁচু হয়ে। খুব ভাল কথা। ঢেউ যত উঁচু হবে, বুলেটের পক্ষে টারজানকে স্পর্শ করা তত হবে শক্ত। আশা হচ্ছে! আশা হচ্ছে টারজানের যে নিরাপদেই সে পারবে নদীটা পেরুতে।

সাঁ—আ—আ—আঁই—

অতিকায় একটা চাবুক যেন বাতাস কেটে ঘুরপাক খেয়ে গেল টারজানের মাথার উপর দিয়ে। কুমিরের লেজ!

…ঘুরপাক খেয়ে গেল টারজানের মাথার উপর দিয়ে।

আর টারজান? চোখে দেখার আগে তো বটেই, কানে শোনারও আগে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে সড়াৎ করে নেমে পড়েছে জলে, ঘোড়ার পাশেই ভাসছে লাগাম ধরে। কী বুঝে সে নামল জলে? কী করে জানল যে শিফ্‌টাদের বুলেটের চেয়েও সাংঘাতিক বিপদ এই মুহূর্তেই তাকে গ্রাস করতে আসছে অন্য একদিক থেকে?

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে একটা কথা আছে, এ তাই। বন্য জন্তুদের থাকে এটি, টারজানও তো বন্য জন্তুরই শামিল। যা ঘটতে যাচ্ছে এক্ষুনি, তার আভাস সে পায় ঘটনার পূর্ব মুহূর্তে।

কুমিরের লেজের ঝটকা থেকে সে রেহাই পেয়েছে, কিন্তু এখন? এবার আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়, চর্মচক্ষু দিয়েই পিছনে তাকিয়ে সে দেখল, কয়েক ফুট মাত্র দূরেই সেই মহাকুমীর মুখ ব্যাদান করে ধেয়ে আসছে তাকে গ্রাস করবার জন্য। এখন? (ক্রমশঃ)

---

১৯৩ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

১। কাপের হ্যাণ্ডেল ভুল লাগান। ২। করাতের হ্যাণ্ডেল ভুল লাগান। ৩। টেপের গায়ে লেখা উল্টো। ৪। হাতীর কান ছোট। ৫। বেড়ালের পেছনে খরগোশের লেজ। ৬। ময়লাতোলা পাত্রর হাতল নেই।

আমার কথায় রমেশ হেসে উঠল।

ফকিরের মাদুলি

সুশীল দাশগুপ্ত

বাগনান স্টেশন থেকে পাঁচটা পনেরর ডাউন পাঁশকুড়া লোকালে উঠলুম। ট্রেনে তেমন ভীড় নেই,—বসবার জায়গা খুঁজছি।

—'আরে বিনয় না?—এদিকে আয়, বসবার জায়গা আছে।' ডাক শুনে সামনের বেঞ্চিতে বসা গোলগাল ফর্সা ভদ্রলোকটির দিকে তাকালাম। চেনা চেনা মনে হচ্ছে—ঠিক ঠাওর করতে পারছি না। তারপর মনে পড়তেই সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলুম,—'রমেশ,—তুই? কত দিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা।'

—'তা প্রায় পনের বছর হবে।—তুই যে সেই কলকাতা থেকে বদলী হলি তারপর তো তোর পাত্তাই নেই। তা একি চেহারা হয়েছে তোর? কত রোগা হয়ে গেছিস, কেমন বুড়োটে মেরে গিয়েছিস।'—রমেশ আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে। মুখে তার সেই মিষ্টি হাসি যা কলেজ জীবন থেকে দেখে আসছি!

—'বলছি সব, একটু দম নিতে দে?'—রমেশের পাশে আয়েশ করে বসে বললাম, সরকারী বদলীর চাকরি। নানান ঘাটের জল খেয়ে শরীরের এই হাল। তার ওপর কাল রোগ—হাঁপানি, দশবছর ধরে ভুগছি ভাই। ওষুধ পত্তর, মাদুলি, টোটকা, দৈব—কিছুই বাদ রাখি নি কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বছরখানেক হল বাগনানে বদলী হয়েছি। কলকাতা থেকেই রোজ যাতায়াত করি।—তা তোর কথা বল, বিয়ে থা' করে ঘর-সংসারী হয়েছিস না সেই চিরকুমার আদর্শবাদী শিক্ষকই আছিস?'

আমার কথায় রমেশ হেসে উঠল, বলল—'শিক্ষকই আছি বটে তবে চিরকুমার আর থাকতে পারলাম কৈ? সংসারী হয়েছি অনেকদিন,—একটি মাত্র ছেলে, তার বয়সও তো এই তের বছর হল।—আর হ্যাঁ, খুব ভাল কথা মনে পড়ে গেল। তোর তোর হাঁপানির জন্য তো তুই অনেক কিছুই করেছিস বললি, আমি তোকে একটা

মাদুলি যোগাড় করে দেব। আমাদের গ্রামের এক ফকিরের দেওয়া, মাদুলি ধারণ করে অনেকের রোগ সেরে গেছে, আমি নিজে দেখেছি। পরের সপ্তাহে যে কোন একদিন অফিস ফেরত চলে আয় না আমার ওখানে। বাগনান থেকে পাঁশকুড়া তো কাছেই। পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে মাইল তিনেক পথ হাঁটলেই আমাদের পলাশপুর গ্রাম। গ্রামে ঢুকে যাকে জিজ্ঞেস করবি রমেশ মাস্টারের বাড়ি, সেই তোকে দেখিয়ে দেবে। রাত্রে থাকবি আমার ওখানে, সারারাত দুজনে প্রাণ খুলে গল্প করা যাবে।—পরের দিন ফকির সাহেবের দরগায় সিন্নি চড়িয়ে মাদুলি ধারণ করবি। আমি বলছি এই মাদুলিতে তোর রোগ সারবেই।

আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম,—'দেখ তিন মাইল পথ আমার মত হেঁপো রুগীর পক্ষে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব, তা ছাড়া ডেলী প্যাসেঞ্জারী করে হাঁপানির টানটা যেন আজকাল বেড়েছে।'

—'ঠিকই তো, কথাটা আমার খেয়াল হয় নি। তাহলে এক কাজ করা যাক।'—রমেশ পকেট থেকে নোট বই বের করে পাতা উলটে বললে, 'আজ ৫ই এপ্রিল, এর পরের শনিবার আমার ইস্কুলের মিটিং, তার পরের শনিবার অর্থাৎ ১৯শে এপ্রিল,—আমি ফকিরের কাছ থেকে মাদুলি নিয়ে ৪টা ১৫এর পাঁশকুড়া লোকালে বাগনান স্টেশনে আসব। তুই আমার জন্যে স্টেশনে অপেক্ষা করবি। নে, তারিখটা নোট করে রাখ, ভুলে যাস নি যেন। আমি ঠিক সময়মত আসব।'

—'বেশ তাই হবে। মাদুলি ধারণ করে সুস্থ হলে নিশ্চয়ই কদিন গিয়ে তোর কাছে কাটিয়ে আসব।'

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে রমেশকে বিদায় দেবার সময় অনেক করে অনুরোধ জানালাম আমার বাসায় একদিন আসবার জন্য।

*　　*　　*　　*　　*

১৯শে এপ্রিল শনিবার। বাগনান স্টেশনে অপেক্ষা করছি রমেশের জন্য। ৪টা ১৫এর পাঁশকুড়া লোকাল বাগনান স্টেশনে এসে থামল। যাত্রীদের মধ্যে রমেশকে খুঁজছি। কোথায় রমেশ?—গাড়ির এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে এলাম,—রমেশকে দেখলাম না।

ট্রেন ছেড়ে দিল। নাঃ, রমেশ আসে নি, কিন্তু রমেশ তো কথা দিয়ে কথা না রাখার মত লোক না। তবে কি তার কোন অসুখবিসুখ করল? কে জানে? ভাবতে ভাবতে প্ল্যাটফরমের ওপর পায়চারি করছি। ওভার ব্রিজের কাছে আসতেই দেখি ব্রিজের নীচে নিমগাছটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে,—আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

—এই নে, ধর তোর মাদুলি।

ভাল করে তাকাতেই অবাক্ হয়ে দেখি—রমেশ। সাদা চাদরে তাঁর আপাদমস্তক ঢাকা, মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ, বিষাদময়। কাছে যেতেই ভাঙা ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে রমেশ বলল,—'নে হাত পাত বিনয়, এই নে, ধর তোর মাদুলি। কাল ভোরে খালি পেটে ধারণ করবি। তিনদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তোর রোগ সেরে যাবে!'—বলেই হাত বাড়িয়ে আলগোছে মাদুলিটি আমার হাতে ফেলে দিল।

হাতের মধ্যে মাদুলিটা দেখছি। —সাধারণ তামার মাদুলি, আংটায় একটা কালো সুতো বাঁধা। মাদুলিটা সযত্নে পকেটে ভরে চোখ তুলে তাকিয়েই দেখি রমেশ নেই। ঠিক সেই সময় ওপাশের লাইনে পাঁশকুড়াগামী লোকাল ট্রেন এসে দাঁড়াল। আমি অবাক্ হয়ে ভাবছি রমেশ আমাকে কোন কথা না বলে চোখের নিমেষে ওপারে ট্রেন ধরতে চলে গেল। যত তাড়াই তার থাক সামান্য দুটো মুখের কথা বলে যেতে রমেশ ভুলে গেল?—রমেশের ব্যবহারে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

মাদুলী ধারণ করে সত্যিসত্যিই উপকার পেলাম। তিন দিনের মধ্যেই টানটা একেবারে কমে গেল। দিন দিনই সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু রমেশের সে-দিনের ব্যবহার এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারলাম না। হঠাৎ মনে হল, নাঃ আমারই ভুল। আমি বৃথা রমেশকে দোষ দিচ্ছি। রমেশের শরীর নিশ্চয়ই সেদিন খুব অসুস্থ ছিল। তাই চাদর মুড়ি দিয়ে অনেক কষ্টে শুধু তাঁর কথা রাখবার জন্যে বাগনান স্টেশনে এসেছিল। হয়তো ভাল করে কথা বলবার মত শক্তিও তার ছিল না। তাই আমার হাতে মাদুলিটা দিয়েই ফিরতি ট্রেনে উঠে চলে গিয়েছে। মনে মনে স্থির করলাম পরের রবিবার রমেশের বাড়ি যাব। রমেশের খোঁজ নিয়ে আসব। তিন মাইল পথ হাঁটতে এখন আর আমার কোন কষ্ট হবে না।

পরের রবিবার পলাশপুর গ্রামে পৌঁছে রমেশের বাড়ি খুঁজে পেতে কোন অসুবিধাই হল না। জিজ্ঞেদ করতেই একটি ছেলে আমাকে রমেশের বাড়ি দেখিয়ে দিল। সদর দরজায় কড়া নাড়লাম,—হাঁক দিয়ে ডাকলাম—'রমেশ—রমেশ বাড়ি আছো নাকি?'

দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল তের-চৌদ্দ বৎসরের একটি ছেলে। ঠিক রমেশের মুখের আদল কিন্তু তাঁর দিকেই তাকিয়েই আমি আঁতকে উঠলাম। কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলাম,—'তুমি, তুমি কি রমেশের ছেলে, তোমার এ বেশ কেন? গলায় উত্তরীয় কেন? রমেশ কোথায়? কেমন আছে শীগগির বল।'

—'বাবা নেই। গত ১৯শে এপ্রিল শনিবার দুপুর দুটোর সময় তিনি আমাদের ছেড়ে হঠাৎ চলে গেছেন। ইস্কুল থেকে বেলা বারটা নাগাদ ফিরে এসে বললেন,—শরীরটা ভাল না—শুয়ে পড়লেন। আর উঠলেন না। ডাক্তার এসে বললেন স্ট্রোক, করোনারী থ্রম্বোসিস।'—ছেলেটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—'কি বললে?—শনিবার ১৯শে এপ্রিল, বেলা দুটোয় রমেশ মারা গিয়েছে?' আমি আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল—'হ্যাঁ।'

আমার মাথাটা ঘুরে উঠল। ভাবলুম সে কি করে সম্ভব? রমেশ যে ঠিক সেদিনই বিকেল প্রায় সাড়ে চারটের সময় বাগনান স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করল। মাদুলিটা আমার হাতে দিল, যা ধারণ করে আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে, তবে কি সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী রমেশের অশরীরী আত্মা তাঁর পণ-রক্ষা করবার জন্যে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরেও ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে মাদুলিটি তাঁর বন্ধুর হাতে দিয়ে গেল। এ-ও কি সম্ভব?

আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। মাদুলিটি আজও আমার কাছে আছে।

কাহিনী শেষ করে বিনয় মজুমদার থামলেন। চোখে তাঁর জল। আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁর বৈঠকখানায় বসে কাহিনী শুনছিলাম। একটু থেমে তিনি আমায় বললেন,—দাশগুপ্ত, তুমি তো গল্প-টল্প লেখো,—পারলে কাহিনীটি লিখো।*

* একটি সত্য ঘটনার ছায়ায়

হাঁদা ভোঁদার

জ্ঞানদান

অ্যাই ভোঁদা, দাঁড়া! রাস্তায় যেতে যেতে ওটা কি পড়ছিস?

এ ভাবে বইয়ের ওপর চোখ রেখে পথ চলা খুব বিপজ্জনক, তা জানিস?

কোথা দিয়ে যাচ্ছিস সব সময় সে দিকে নজর রাখবি!

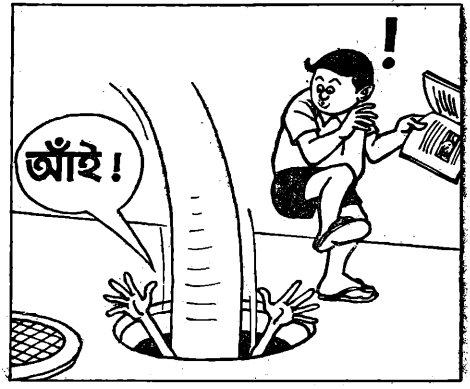
আঁই!

শুকতারাটা এবারে পড়বো রে হাঁদা?

পরে
এ কি! তুই এ ভাবে রাস্তার একেবারে ধারে বসে পড়ছিস?

এ ভাবে রাস্তার ধারে বসে পড়া উচিত নয়! যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে!
ক্যাঁ-অ্যাচ!
বাপরে গেছি রে!
বসার আর জায়গা খুঁজে পাওনি, হতচ্ছাড়া উজবুক!
দেখলি তো, রাস্তার ধারে বসা কতো বিপদসঙ্কুল! পা টা একেবারে থেঁৎলে দিয়েছে রে!
তাহলে তুই-ই ঠিক কর না নিরাপদ জায়গাটা কোথায়!
এই দ্যাখ ভোঁদা! সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা! এখানে উঠে আয়।
ক্র্যা·র·র·র·র·র....

অনিল ভৌমিক

১

অনেকদিন আগের কথা। শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে চলেছে একটা নিঃসঙ্গ পালতোলা জাহাজ।

যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল—সীমাহীন সমুদ্র।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে পশ্চিমের আকাশটা যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। জাহাজের ডেকএ দাঁড়িয়ে সেইদিকে তাকিয়েছিল ফ্র্যান্সিস। সে কিন্তু পশ্চিমের আবীর-ঝরা আকাশ দেখছিল না। সে ছিল নিজের চিন্তায় মগ্ন। ডেকএ পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিল কখনো আকাশের দিকে কখনো সমুদ্রের দিকে। তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা- সোনার ঘণ্টার গল্পটা কি সত্যি না সবটাই গুজব। নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী একটা ঘণ্টা- বিরাট ঘণ্টা—এই ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি কোন দ্বীপে নাকি আছে সেটা। কেউ বলে সেই সোনার ঘণ্টাটা নাকি জাহাজের মাস্তুলের সমান উঁচু, কেউ বলে সাত আট মানুষ সমান উঁচু। যত বড়ই হোক—নিরেট সোনা দিয়ে তৈরী একটা ঘণ্টা সোজা কথা নয়।

এই ঘণ্টাটা তৈরি করার ইতিহাসও বিচিত্র। স্পেনদেশের সমুদ্রের ধারে ডেমেলো নামে ছোট্ট একটা শহর। সেখানকার গীর্জায় থাকতো জনপঞ্চাশেক পাদ্রী। তারা দিনের বেলায় পাদ্রীর কাজকর্ম করতো। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই পাদ্রীর পোশাক খুলে ফেলে সাধারণ পোশাক পরে নিত। তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরুত ডাকাতি লুঠপাট করতে। প্রতি রাত্রে দশ

পনেরজন করে বেরুত। টাকা পয়সা লুঠ করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য শুধু একটাই —সোনা সংগ্রহ করা। শুধু সোনাই লুঠ করত তারা।

ধারেকাছে শহরগুলোতে এমন কি দূর দূর শহরেও তারা ডাকাতি করতে যেত। ভোর হবার আগেই ফিরে আসত ডেমেলোর গীর্জায়। গীর্জার পেছনে ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়েছিল। সেখানে বিরাট একটা ঘণ্টার ছাঁচ মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল। সোনার মোহর অলংকার যা কিছু ডাকাতি করে আনত সব গলিয়ে সেই ঘণ্টার ছাঁচে ফেলে দিত। এইভাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর সোনা দিয়ে ছাঁচ ভরানো চলল।

কিন্তু ঘণ্টাটা অর্ধেক তৈরি হবার পর কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এত ডাকাতি হতে দেখে দেশের সব বড়লোকেরা সাবধান হয়ে গেল। তারা সোনা সরিয়ে ফেলতে লাগল। ডাকাতি করে সিন্দুক ভেঙে পাদ্রী ডাকাতরা পেতে লাগল শুধু টাকা পয়সা। মোহর বা সোনার অলংকারের নামগন্ধও নেই।

কী করা যায়? ডাকাত পাদ্রীরা সব মাথায় হাত দিয়ে বসল। সোনার ঘণ্টাটা অর্ধেক হয়ে থাকবে? তারা যখন ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না, তখন একজন পাদ্রী খবর নিয়ে এল—দেশের সব বড়লোকেরা বিদেশে সোনা সরিয়ে ফেলছে জাহাজে করে, ব্যাস। অমনি পাদ্রী ডাকাতরা ঠিক করে ফেলল এবার জাহাজ লুঠ করতে হবে। যেমন কথা তেমনি কাজ। একটা জাহাজ কিনে ফেলল তারা। তারপর নিজেদের মধ্যে থেকে তিরিশজন বাছাই করা লোক নিয়ে একদিন গভীর রাত্রে তারা সমুদ্র জাহাজ ভাসাল। বাকী পাদ্রীরা গীর্জাতেই রইল লোকের চোখে ধুলো দিতে হবে তো! ডেমেলো শহরের লোকেরা জানল—গীর্জার তিরিশজন পাদ্রী বিদেশে গেছে ধর্মপ্রচারের জন্যে। কারো মনেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

দীর্ঘ তিন চার মাস ধরে পাদ্রী ডাকাতরা সমুদ্রের বুকে ডাকাতি করে বেড়াল। স্পেনদেশ থেকে যত জাহাজ সোনা নিয়ে বিদেশে যাচ্ছিল কোন জাহাজই রেহাই পেল না।

লুঠতরাজ শেষ করে ডাকাত পাদ্রীরা ডেমেলো শহরের গীর্জায় ফিরে এল। জাহাজ থেকে নামানো হল সোনাভর্তি বাক্স। দেখা গেল কুড়িটা কাঠের বাক্স ভর্তি অজস্র মোহর আর সোনার অলংকার। সবাই খুব খুশী হল। যাক এতদিনে ঘণ্টাটা পুরো তৈরী হবে।

ঘণ্টাটা সম্পূর্ণ তৈরী হল। কিন্তু তারা মাটির ছাঁচটা ভেঙে ফেলল না। ছাঁচ ভেঙে ফেললেই তো সোনার ঘণ্টাটা বেরিয়ে আসবে। যদি সোনার ঝকমকানি কারো নজরে পড়ে যায়?

তারপরের ঘটনা সঠিক জানা যায় না। তবে ফ্র্যান্সিস বুড়ো নাবিকদের মুখে গল্প শুনেছে ডাকাত পাদ্রীরা নাকি একটা মস্তবড় কাঠের পাটাতনে সেই সোনার ঘণ্টা তুলে নিয়ে জাহাজের পেছনে বেঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। ভূমধ্যসাগরের ধারে কাছে এক নির্জন দ্বীপে তারা সোনার ঘণ্টাটা লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর ফেরার পথে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ডাকাত পাদ্রীদের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। একজনও বাঁচে নি। কাজেই সেই নির্জন দ্বীপের হদিস আজও সবার কাছে অজানাই থেকে গেছে।

—এই যে ভায়া!

ফ্র্যান্সিসের চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ভুঁড়িওলা জ্যাকব কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ও বুঝতেই পারে নি।

জ্যাকব হাসতে হাসতে বলল—ভুরু কুঁচকে কী ভাবছিলে অত?

ফ্র্যান্সিস নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশটা দেখাল।

—ওখানে কী? জ্যাকব বোকাটে মুখে জিজ্ঞেস করল।

—ওখানে—আকাশে কত সোনা—অথচ সব ধরাছোঁয়ার বাইরে।

জ্যাকব এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাজখাঁই গলায় হেসে উঠল—'ফ্র্যান্সিস—তোমার মিগঘাৎ খিদে পেয়েছে খাবে চলো।'

খেতে বসে দু'জনে কথাবার্তা বলতে লাগল। ফ্র্যান্সিস জাহাজের আর কোন নাবিকের সঙ্গে বেশী মিশত না। ওর ভালোও লাগত না। কিন্তু এই ভুঁড়িওলা জ্যাকবের সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ও জ্যাকবের কাছে মনের কথা খুলে বলত।

ফ্র্যান্সিস ছিল জাতিতে ভাইকিং। ইওরোপের পশ্চিম সমুদ্রতীরে ভাইকিংদের দেশ। ভাইকিংদের অবশ্য বদনাম ছিল জলদস্যুর জাত বলে। তবে শৌর্যেবীর্যে আর জাহাজ চালনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্যে ইওরোপের সব জাতিই তাদের সমীহ করত। ফ্র্যান্সিস কিন্তু সাধারণ ঘরের ছেলে ছিল না। ভাইকিংদের রাজার মন্ত্রীর ছেলে সে। কিন্তু এই বিদেশী জাহাজে যাচ্ছিল সাধারণ নাবিকের কাজ নিয়ে—নিজের পরিচয় গোপন করে। এটা জানত শুধু ভুঁড়িওলা জ্যাকব। মুরগীর ঠ্যাং চিবুতে চিবুতে জ্যাকব ডাকল—

—ফ্র্যান্সিস?

—হুঁ।

—তুমি বাপু দেশে ফিরে যাও।

—কেন?

—আমাদের এই দাঁড়বাওয়া, ডেক-মোছা—এসব কম্ম তোমার জন্যে নয়।

ফ্র্যান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—তোমার কথাটা মিথ্যে নয়। এত পরিশ্রমের

কাজ আমি জীবনে করিনি। কিন্তু জানো তো—আমরা ভাইকিং—যে কোনরকম কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের জন্মগত। তা ছাড়া—

—কী?

—ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি সেই সোনার ঘণ্টার গল্প—

—ও। সেই ডাকাত পাদ্রীদের সোনার ঘণ্টা? আর ভাই ওটা একটা গাঁজাখুরী গপ্পো।

—আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

—তবে?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভূমধ্য-সাগরের ধারে কাছে—কোন দ্বীপে নিশ্চয়ই সেই সোনার ঘণ্টা আছে।

—পাগল। জ্যাকব খুক্ খুক্ করে হেসে উঠল।

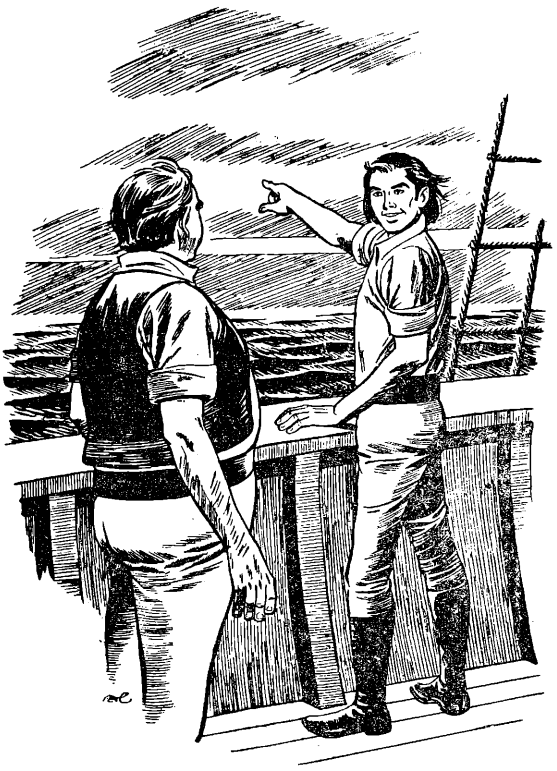

ফ্র্যান্সিস আঙুল দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশটা দেখাল। [পৃষ্ঠা ২১০

ফ্র্যান্সিস একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপাস্বরে বলল—জানো—দেশ ছাড়ার আগে—একজন বুড়ো নাবিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বুড়োটা বলত—ও নাকি সোনার ঘণ্টার বাজনা শুনেছে।

—এ্যাঁ বলো কি! জ্যাকব অবাক চোখে তাকাল।

—লোকে অবশ্য বুড়ো নাবিকটাকে পাগল বলে ক্ষেপাত। আমি কিন্তু মন দিয়ে ওর গল্প শুনেছিলাম।

—কী গল্প?

—ভূমধ্যসাগর দিয়ে নাকি ওদের জাহাজ আসছিল একবার। সেই সময় এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ে ওরা দিক্ ভুল করে ফেলে। তারপর ডুবো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ওদের জাহাজ ডুবে যায়। ডুবন্ত জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় ও একটা ঘণ্টার শব্দ শুনেছিল—ঢং—ঢং। ঝড়জলের শব্দ ছাপিয়ে সেই শব্দ বেজেই চলেছিল—ঢং ঢং।

জ্যাকবের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে হাঁ করে ফ্র্যান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করল—সোনার ঘণ্টার শব্দ ?

—নিশ্চয়ই। ফ্র্যান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

ভুঁড়িওলা জ্যাকবের মুখ দিয়ে আর কথা সরল না।

পরের দুদিন জাহাজের নাবিকদের বেশ আনন্দেই কাটল। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। জোর বাতাস। জাহাজের পালগুলো হাওয়ায় তোড়ে বেলুনের মত ফুলে উঠল। জাহাজ চলল তীরবেগে। দাঁড়টানার হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে নাবিকরা এই দুদিন রেহাই পেল। কিন্তু জাহাজের ডেক পরিষ্কার করা, জাহাজের মালিকের ফাইফরমাস খাটা ঐসব করতে হল। তবু নাবিকরা সময় পেল—তাস খেলল, ছক্কাপাঞ্জা খেলল, আড্ডা দিল, গল্পগুজব করল অনেক রাত পর্যন্ত।

ফ্র্যান্সিস যতক্ষণ সময় পেয়েছে হয় ডেক-এ পায়চারি করেছে, নয়তো নিজের বিছানায় শুয়ে থেকেছে। ভুঁড়িওলা জ্যাকব মাঝে মাঝে ওর খোঁজ করে গেছে। শরীর ভালো আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছে। একটু খোশগল্পও করতে চেয়েছে। কিন্তু ফ্র্যান্সিসের তরফ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে অন্য নাবিকের আড্ডায় গিয়ে গল্প জুড়েছে। ফ্র্যান্সিসের একা থাকতে ভালো লাগছিল। নিজের চিন্তায় ডুবে থাকতে। দেশ ছেড়েছে কতদিন হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছে ও। কবে ফিরবে অথবা কোনদিন ফিরতে পারবে কি না কে জানে। মাথায় ওর মাত্র একটাই সংকল্প—যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে সোনার ঘণ্টার হদিস।

সোনার ঘণ্টার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল ফ্র্যান্সিস জানে না। হঠাৎ নাবিকদের দৌড়াদৌড়ি উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু হল কী ? এদের এত উত্তেজনার কারণ কী ? এমন সময় জ্যাকব ছুটতে ছুটতে ফ্র্যান্সিসের কাছে এল।

—সাংঘাতিক কাণ্ড। জ্যাকব তখনও হাঁপাচ্ছে।

—কী হয়েছে ?

—ওপরে—ডেক-এ চল—দেখবে'খন।

দ্রুতপায়ে ফ্র্যান্সিস ডেক-এর ওপরে উঠে এল। জাহাজের সবাই ডেক-এর ওপর এসে জড়ো হয়েছে। ফ্র্যান্সিস জাহাজের চারপাশে সমুদ্র আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে গেল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল তখন। আর বেলাও হয়েছে। অথচ চারদিকে কুয়াশায়

ঘন আস্তরণ। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে। চারদিকে কেমন একটা মেটে আলো। এক ফোঁটা বাতাস নেই। জাহাজটা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছাপ। এই অসময়ের কুয়াশা? এ কোন অমঙ্গলের চিহ্ন নয় তো?

জাহাজের মালিক সর্দার-নাবিককে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। বোধহয় কী করবে এখন তারই শলা-পরামর্শ করতে।

সবাই বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ফ্র্যান্সিস খুশীতে শিস দিয়ে উঠল। আশ্চর্য! শিসের শব্দ অনেকের কানেই পৌঁছল। এই বিপত্তির সময় কোন্ বেআক্কেলে শিস দেয় রে? তারা ফ্র্যান্সিসের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। দেখল—ফ্র্যান্সিসের মুখে মৃদু হাসি। এবার ওদের আরো অবাক্ হবার পালা। ফ্র্যান্সিসকে ওরা কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। সব সময় গোমড়া মুখ ভুরু কুঁচকে থাকতেই দেখেছে। মাথায় যেন রাজ্যের দুশ্চিন্তা। সেই গোমড়মুখো লোকটা হাসছে? অবাক কাণ্ড!

ফ্র্যান্সিসের এই খুশীতে হঠাৎ শিস দিয়ে ওঠাটা কেউই ভালো চোখে দেখল না। এমন কি ওর বন্ধু জ্যাকবও না। কিন্তু এই নিয়ে কেউ কোন কথাও বলল না। তবে মনে মনে গজরাতে লাগল।

জ্যাকব গম্ভীর মুখে ফ্র্যান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। চাপাস্বরে বলল—বেশী বাড়াবাড়ি করো না।

—কেন?

—সবাই ভয়ে মরছি আর তুমি কিনা শিস দিচ্ছো?

ফ্র্যান্সিস হেসে উঠল। জ্যাকব মুখ বেজার করে বলল—তোমরা ভাইকিং—খুব সাহসী তোমরা—কিন্তু তাই বলে তোমার কি মৃত্যুভয়ও নেই?

—আছে বৈ কি! তবে আমার খুশী হবার কারণ আছে।

—বলো কি?

—হ্যাঁ। ফ্র্যান্সিস জ্যাকবের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা খুশীর স্বরে বলতে লাগল—জানো সেই বুড়ো পাগলাটে নাবিকটা বলেছিল—ওদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়বার আগে, ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ার আগে—এমনি ঘন কুয়াশার মধ্যে আটকে গিয়েছিল—ঠিক এমনি অবস্থা—বাতাস নেই, কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার—।

ফ্র্যান্সিস আর জ্যাকব ডেকএর কোণায় দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছিল তখন লক্ষ্য করে নি যে ডেকএর আর এক কোণে নাবিকদের একটা জটলার সৃষ্টি হয়েছে। ওরা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছে। দু' একজন চোখের ইশারায় জ্যাকবকে দেখল। ব্যাপারটা সুবিধের নয়। কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলছে। জ্যাকব সজাগ হল।

ফ্র্যান্সিস এত সব লক্ষ্য করে নি। ও উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে সামনের সাদাটে কুয়াশার আস্তরণের দিকে তাকিয়ে নিজের চিন্তায় বিভোর। নাবিকদের জটলা থেকে তিন চারজন ষণ্ডাগোছের নাবিক ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। জ্যাকব ওদের মুখ দেখেই বুঝল কিছু একটা কুমতলব আছে ওদের। ফ্র্যান্সিসকে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিল। ফ্র্যান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জ্যাকবের দিকে তাকাল। জ্যাকব চোখের ইশারায় ষণ্ডাগোছের লোকগুলোকে দেখাল। তাদের পেছনে পেছনে আর সব নাবিকেরা দল বেঁধে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। ফ্র্যান্সিস বুঝল কিছু একটা মতলব নিয়েই ওরা এদিকে আসছে। ও কিন্তু এই থমথমে আবহাওয়াটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে হেসে গলা চড়িয়ে বলল—ব্যাপার কি? অ্যাঁ—এখানে নাচের আসর বসবে নাকি? কিন্তু কেউ ওর কথার জবাব দিল না। ষণ্ডাগোছের লোক ক'জন ওদের দু'জনের কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরে এসে দাঁড়াল। দলের মধ্যে থেকে ইয়া দশাসই চেহারার একজন গম্ভীরগলায় ডাকল —এই জ্যাকব শোন এদিকে।

ফ্র্যান্সিস তখন হেসে বলল—যা বলবার বাপু ওখান থেকেই বলো না।

সেই নাবিকটা এবার আঙুল দিয়ে জ্যাকবকে দেখিয়ে পেছনের নাবিকদের ভীড়ের দিকে তাকিয়ে বলল—'এই জ্যাকব ব্যাটা ইহুদী। এই বিধর্মীটা যতক্ষণ জাহাজে থাকবে—ততক্ষণ কুয়াশা কাটবে না—বিপদ আরো বাড়বে। তোমরাই বলো ভাই—এই অলুক্ষুণেটাকে কী করবো? হইহই চিৎকার উঠল নাবিকদের মধ্যে।

তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে বলল কেউ কেউ—

—জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

—খুন কর বিধর্মীটাকে।

—ফাঁসীতে লটকাও।

ভয়ে জ্যাকবের মুখ সাদা হয়ে গেল। কিছু বলবার জন্যে ওর ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল। কিছুই বলতে পারল না। দুহাতে মুখ ঢেকে ও কেঁদে উঠল। দশাসই চেহারার নাবিকটা জ্যাকবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করতেই ফ্র্যান্সিস জ্যাকবকে আড়াল করে দাঁড়াল। ফ্র্যান্সিসের তখন অন্য চেহারা। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সমস্ত শরীরটা ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে। চোয়াল শক্ত। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। দাঁতচাপা স্বরে ফ্র্যান্সিস বলল—জ্যাকব আমার বন্ধু। যে ওর গায়ে হাত দেবে তার হাত আমি ভেঙে দেব।

এক মুহূর্তে গোলমাল হইচই থেমে গেল। ষণ্ডা কজন থমকে দাঁড়াল। কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল—দু'টোকেই জলে ছুঁড়ে ফেলো।

আবার চিৎকার, মার মার রব উঠল। ফ্র্যান্সিস আড়চোখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখল ডেকএর কোণার দিকে একটা ভাঙা দাঁড়ের হাতলের অংশটা পড়ে আছে। চোখের নিমেষে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে লাঠির মত বাগিয়ে ধরল। চেঁচিয়ে বলল—মরদ হোস তো এক একজন করে আয়।

দশাসই চেহারার লোকটা ফ্র্যান্সিসের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদ্যুৎগতিতে একপাশে সরে গিয়ে ফ্র্যান্সিস হাতের ভাঙা দাঁড়টা চালাল ওর মাথা লক্ষ্য করে। লোকটার মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরুল শুধু—'অঁক।' তারপরই সে ডেকএর ওপর সশব্দে মুখ থুবড়ে পড়ল। মাথাটা দু'হাতে চেপে কাতরাতে লাগল। ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই থমকে দাঁড়াল। কিন্তু এক মুহূর্ত। তারপরেই আর একটা ষণ্ডাগোছের লোক ঘুঁষি বাগিয়ে ফ্র্যান্সিসের দিকে তেড়ে এল। ফ্র্যান্সিস তৈরী হয়েই ছিল। ভাঙা দাঁড়টা সোজা লোকটার থুতনি লক্ষ্য করে চালাল। লোকটা বেমক্কা মার খেয়ে দু'হাত শূন্যে তুলে ডেকএর পাটাতনের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল। দাঁত ভাঙল কয়েকটা। মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। মুখ চেপে ধরে লোকটা গোঙাতে লাগল।

ফ্র্যান্সিস উত্তেজিত নাবিকদের জটলার দিকে চোখ রেখে চাপাস্বরে ডাকল—জ্যাকব।

জ্যাকব এতক্ষণে সাহস ফিরে পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে ফ্র্যান্সিসের মত রুখে না দাঁড়াতে পারলে মরতে হবে। জ্যাকব চাপাস্বরে উত্তর দিল—কী ?

—ঐ যে ডেকঘরের দেয়ালে সর্দারের বেল্টসুদ্ধ তরোয়ালটা ঝোলানো রয়েছে—ঐ যে দেখেছো ?

—হ্যাঁ।

—এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এসো। ভয় নেই—একবার তরোয়ালটা হাতে পেলে সবকটাকে আমি একাই নিকেশ করতে পারবো।—জলদি—ছোট—।

জ্যাকব পড়ি কি মরি ছুটল ডেক-ঘরের দেয়ালের দিকে। নাবিকের দল কিছু বোঝবার আগেই ও দেয়ালে ঝোলানো তরোয়ালটা খাপ থেকে খুলে নিল। এতক্ষণে নাবিকের দল ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সবাই হইহই করে ছুটল জ্যাকবকে ধরতে। জ্যাকব ততক্ষণে তরোয়ালটা ছুড়ে দিয়েছে ফ্র্যান্সিসের দিকে। তরোয়ালটা ঝমাৎ করে এসে পড়ল ফ্র্যান্সিসের পায়ের কাছে। তরোয়ালটা তুলে নিয়েই ফ্র্যান্সিস ছুটল ভীড়ের দিকে। ততক্ষণে ক্রুদ্ধ নাবিকের দল জ্যাকবকে ঘিরে ধরেছে। কয়েকজন মিলে জ্যাকবকে ধরে ডেক-ঘরের কাঠের দেয়ালে ওর মাথা ঠুকিয়ে দিতে শুরু করেছে। কিন্তু খোলা তরোয়াল হাতে ফ্র্যান্সিসকে ছুটে আসতে দেখে ওরা জ্যাকবকে ছেড়ে দিয়ে এদিক ওদিক ছুটে সরে

গেল। ফ্র্যান্সিস সেই নাবিকদলের দিকে তরোয়াল উঁচিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—জ্যাকব বিধর্মী হোক আর যাই হোক—ও আমার বন্ধু। যদি তোদের জানের মায়া থাকে। জ্যাকবের গায়ে কেউ হাত দিবি না।

ফ্র্যান্সিসের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে সবাই বেশ ঘাবড়ে গেল। ওরা জানত—ফ্র্যান্সিস জাতিতে ভাইকিং। তরোয়াল হাতে থাকলে ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল।

ডেক-এর ওপরে এত হইচই চিৎকার ছুটোছুটির শব্দে মালিক আর নাবিক-সর্দার ছুটে ওপরে উঠে এল। ওরা ভাবতেই পারে নি যে ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে। এদিকে দুজন ডেক-এর ওপর রক্তাক্ত দেহে কাতরাচ্ছে—ওদিকে ফ্র্যান্সিস খোলা তরোয়াল হাতে রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে। জাহাজের মালিক আশ্চর্য হয়ে গেল। সে দু হাত তুলে চিৎকার করে বলল—শোন সবাই—মারামারি করবার সময় পরে অনেক পাবে। এখন যে বিপদে পড়েছি তাই থেকে উদ্ধারের কথা ভাবো।

এতক্ষণের উত্তেজনা মারামারির মধ্যে সবাই বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন আবার সবাই ভয় ভয় চোখে চারদিকের ঘন কুয়াশার দিকে তাকাতে লাগল। কারো মুখে কথা নেই। এমন সময় ষণ্ডাগোছের নাবিকদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলল—ঐ যে জ্যাকব—ও ইহুদী—ওর জন্যেই আমাদের এই বিপদ।

আবার গোলমাল শুরু হল। মালিক দু হাত তুলে সবাইকে থামাবার চেষ্টা করতে গেল। গোলমাল একটু কমলে বলল—এটা বাপু জাহাজ—গীর্জে নয় কার কী ধর্ম্ম তাই দিয়ে আমার কী দরকার। আমি চাই কাজের লোক। জ্যাকব তো কাজকর্ম্ম ভালোই করে।

আবার চিৎকার শুরু হল—আমরা ওসব শুনতে চাই না।

—জ্যাকবকে জাহাজ থেকে ফেলে দাও।

—মাস্তুলে ফাঁসি লটকাও।

জাহাজের মালিক ব্যবসায়ী মানুষ। সে কেন একটা লোকের জন্যে ঝামেলা পোহাবে। বলল—

—বেশ তোমরা যেমন চাইছো তাই হবে।

ফ্র্যান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল—আমার হাতে তরোয়াল থাকতে সেটি হবে না।

জাহাজের মালিক পড়ল মহা ফাঁপরে! তবে সে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। খুনোখুনী রক্তপাত—এসবে বড় ভয়। বলল—

—ঠিক আছে—আর একটা দিন সময় দাও তোমরা। দাঁড়ে হাত লাগাও—জাহাজ চলুক—দেখা যাক—যদি একদিনের মধ্যেও কুয়াশা না কাটে তাহলে জ্যাকবকে জলে ছুড়ে ফেলে দিও।

নাবিকদের মধ্যে গুঞ্জন চলল। একটু পরে সেই ষণ্ডাগোছের নাবিকটা বলল—ঠিক আছে—আমরা আপনাকে একদিন সময় দিলাম।

—তাহলে আর দেরি করো না। সবাই যে যার কাজে লেগে পড়। মালিক নাবিক-সর্দারের দিকে ইশারা করল। সর্দার ফ্র্যান্সিসের কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াল। ফ্র্যান্সিস একবার সেই নাবিকদের জটলার দিকে তাকাল। মুখ ফিরিয়ে জ্যাকবের দিকে তাকাল। তারপর তরোয়ালটা সর্দারের হাতে দিয়ে দিল। চাপাস্বরে জ্যাকবকে বলল—ভয় নেই। দেখো—একদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যাবে।

নাবিকদের জটলা ভেঙে গেল। যে যার কাজে লেগে পড়ল। একদল পাল নামাতে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ফ্র্যান্সিসদের দল সর্দারের নির্দেশে জাহাজের খোলে নেমে এল। সেখানে দু'ধারে সার সার বেঞ্চির মত কাঠের পাটাতন পাতা। সামনে একটা লম্বা দাঁড়ের হাতল। বেঞ্চিতে বসে ওরা পঞ্চাশজন দাঁড়ে হাত লাগল। তারপর সর্দারের ইঙ্গিতে একসঙ্গে পঞ্চাশটা দাঁড় পড়ল জলে—ঝপ ঝপ। জাহাজটা নড়েচড়ে চলতে শুরু করল।

ফ্র্যান্সিসের ঠিক সামনেই বসে ছিল জ্যাকব।

দাঁড় টানতে টানতে ফ্র্যান্সিস ডাকল—

—জ্যাকব?

—হুঁ।

—যদি সেই বুড়ো নাবিকটার কথা সত্যি হয় তাহলে—

—তাহলে কী?

—তাহলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঝড়ের মুখে পড়ব।

—তারপর।

—ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে—

—জলের তলায় অক্কা পাবে—

—তার আগে সোনার ঘণ্টার বাজনা তো শুনতে পাবো। জ্যাকব একবার মুখ ফিরিয়ে ফ্র্যান্সিসের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকাল। তারপর বিড়বিড় করে বলল—পাগল।

জাহাজ চলল। ছপ—ছপ—। পঞ্চাশটা দাঁড়ের শব্দ উঠছে। চারদিকে জমে থাকা কুয়াশার মধ্য দিয়ে জাহাজ চলেছে। কেমন একটা গুমোট গরম। দাঁড়ীদের গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। একফোঁটা হাওয়ার জন্যে সবাই হাপিত্যেশ করছে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় সমস্ত জাহাজটা ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। কে কোথায় ছিটকে পড়ল তার ঠিক নেই। পরক্ষণেই প্রবল বৃষ্টিধারা আর

হাওয়ার উন্মত্ত বেগ। তালগাছসমান উঁচু উঁচু ঢেউ জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে পড়তে লাগল। জাহাজটা কলার মোচার মত ঢেউয়ের আঘাতে দুলতে লাগল। এই একবার জাহাজটা ঢেউয়ের গভীর ফাটলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই প্রচণ্ড ধাক্কায় উঠে আসছে ঢেউয়ের মাথায়।

ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় ফ্র্যান্সিস মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে সামলে নিয়েছিল খুব। কারণ ও তৈরীই ছিল—ঝড় আসবেই। আর সবাই এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছিল। হামাগুড়ি দিয়ে কাঠের পাটাতন ধরে ধরে অনেকেই নিজের জায়গায় ফিরে এল। এল না শুধু জ্যাকব। কিছুক্ষণ আগে যে ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে। তারপর ঝড়ের ধাক্কায় টল সামলাতে না পেরে পাটাতনের কোণায় জোর ধাক্কা খেয়ে ও অজ্ঞানের মত পড়েছিল একপাশে। ফ্র্যান্সিস কয়েকবার জ্যাকবকে ডাকল। ঝড়ের গোঁ-গোঁয়ানির মধ্যে সেই ডাক জ্যাকবের কানে পৌঁছল না। ফ্র্যান্সিস দাঁড় ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে জ্যাকবকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় জ্যাকব? আর খোঁজা সম্ভব নয়। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনির মধ্যে টল সামলাতে না পেরে বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল ফ্র্যান্সিস।

হঠাৎ শক্ত কিছুতে ধাক্কা লেগে জাহাজের তলাটা মড়মড় করে উঠল। দাঁড়গুলো প্যাকাটির মত মটমট করে ভেঙে গেল। ফ্র্যান্সিস চমকে উঠল—ডুবোপাহাড়। আর এক মুহূর্ত দেরি না। ফ্র্যান্সিস বহু কষ্টে টলতে টলতে ডেকএর ওপর উঠে এল। দেখল—ঝোড়ো হাওয়ার আঘাতে বিরাট বিরাট ঢেউ ডেকএর ওপর আছড়ে পড়ছে। আর সে কি দুলুনি! ঠিক তখনই সমস্ত জল ঝড় বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ও শুনতে পেল ঘণ্টার শব্দ—
—ঢং—ঢং—ঢং। ঘণ্টা বেজেই চলল। সোনার ঘণ্টার শব্দ।

ফ্র্যান্সিস উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। ঠিক তখনই মড়মড় শব্দে জাহাজের তলাটা ভেঙে গেল আর সেই ভাঙা ফাটল দিয়ে প্রবলবেগে জল ঢুকতে লাগল। মুহূর্তে জাহাজের খোলটা ভরে গেল। জাহাজটা পেছন দিকে কাৎ হয়ে ডুবতে লাগল। সশব্দে মাস্তুলটা ভেঙে পড়ল। জাহাজের রেলিঙের কোণায় লেগে মাস্তুলটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। উত্তাল সমুদ্রের বুকে মাস্তুলের যে টুকরোটা পড়ল সেটার দিকে লক্ষ্য রেখে ফ্র্যান্সিস জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে কোনরকমে ভাঙা মাস্তুলটা জড়িয়ে ধরল। বহুকষ্টে মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা ছেঁড়া দড়িটা দিয়ে নিজের শরীরটা মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে নিল।

ওদিকে সোনার ঘণ্টার শব্দ ফ্র্যান্সিসের কানে এসে বাজছে, ঢং ঢং ঢং।

তারপর? (ক্রমশঃ)

ইণ্টারভিউ

জীবন ভৌমিক

চিঠি পেয়ে ঘোঁতনদার বাবা বললেন—

পত্রপাঠ শ্রীমান ঘোঁতনকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আইস! শ্রীমানের জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করিয়াছি।

হৃদয়পুর থেকে চিঠি লিখেছেন ঘোঁতনদার জেঠামশাই। জেঠামশাই খুব হৃদয়বান লোক। সম্ভবতঃ ঘোতনদার হৃদয় পরিবর্তন করবার জন্যই তাঁর এই প্রচেষ্টা। তখন ঘোঁতনদা অজ পাড়াগাঁয়ে থাকে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। সেই ঘোঁতনদাই এখন স্বনামধন্য পুরুষ। কেউ কি তখন ভাবতে পেরেছে! 'ছেলেটা গাঁয়ে থেকে গেঁয়ো ভূত হচ্ছে। ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও!' ঘোঁতনদার মা বলেছিল ঘোঁতনদার বাবাকে। তখন অবশ্যি এই কলকাতা বোমার কলকাতা ছিল না। সোনার না হলেও রুপোর ছিল।

হৃদয়পুর থেকে চিঠি পেয়ে ঘোঁতনদার বাবা বললেন—চল কলকাতায়। কত ধানে কত চাল বুঝবি। চালিয়াতি চুলোয় উঠবে।

পরের দিনই সকালের ট্রেনে চেপে বসলেন ঘোঁতনদার বাবা, সঙ্গে শ্রীমান ঘোতন। সেই প্রথম কলকাতায় আসা। বিকেলবেলায় শিয়ালদা স্টেশনে নেমে বাসে উঠে সোজা হৃদয়পুর।

জেঠাকে প্রণাম করল ঘোঁতনদা। সোজা কথা সোজাসুজিই বললেন জেঠামশাই—কালকেই আমার সঙ্গে যাবি একটা অফিসে। চাকরি হয়েই আছে। নামমাত্র একটা ইণ্টারভিউ।

পরদিন সকালবেলায় জেঠার সঙ্গে ঘোঁতনদা গেল একটা অফিসে। অফিসের ম্যানেজার বাঙালী সাহেব, ছোট্ট একটা কাঁচের ঘরে বসেছিলেন। ঘোঁতনদাকে তাঁর সামনে বসিয়ে দিয়ে জেঠামশাই চলে গেলেন নিজের কাজে।

কিছুক্ষণ পরে সাহেব ঘোঁতনদাকে জিজ্ঞেস করল—

—ইওর নেম ?

—শ্রীঘোঁতনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঘোঁতঘোঁত করে ঘোঁতনদা জবাব দিল।

সাহেব ঘোঁতনদার দিকে জুলজুল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—শোন, আমি কতগুলি শব্দ বলব, তুমি তার ঠিক বিপরীতার্থক শব্দ বলবে। কী পারবে তো ?

—হ্যাঁ। বোয়াল মাছের মত হাঁ করে ঘোঁতনদা বলল।

সাহেব বলল—ভেরী গুড।

ঘোঁতনদা সঙ্গে সঙ্গে বলল—ভেরী ব্যাড।

সাহেব বলল—আহা! এখন নয়। ওয়েট।

ঘোঁতনদা—ডোণ্ট ওয়েট।

সাহেব—আরে বাবা, এখনও আরম্ভ করিনি।

ঘোঁতনদা—এখন আরম্ভ করেছি।

সাহেব—কী ভয়ানক!

ঘোঁতনদা—কী সুন্দর।

সাহেব—স্টুপিড—

ঘোঁতনদা—ক্লেভার—

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ চলার পর সাহেব রেগে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন—গেট আউট।

ঘোঁতনদা কচি বাতাবিলেবুর মত মুখে আধ ইঞ্চি হাসি ফুটিয়ে বলল—কাম ইন।

এরপর সাহেব সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সেদিনের মত আর ফিরলেন না।

ঘোঁতনদা গাঁট হয়ে সাহেবের ঘরে বসে রইল।

দুপুরের পর জেঠামশাই এসে শ্রীমান ঘোঁতনকে বাড়ি নিয়ে গেলেন।

চাকরিটা ঘোঁতনদার হয়েছিল কি-না সে খবর অবশ্য আমরা পাইনি।

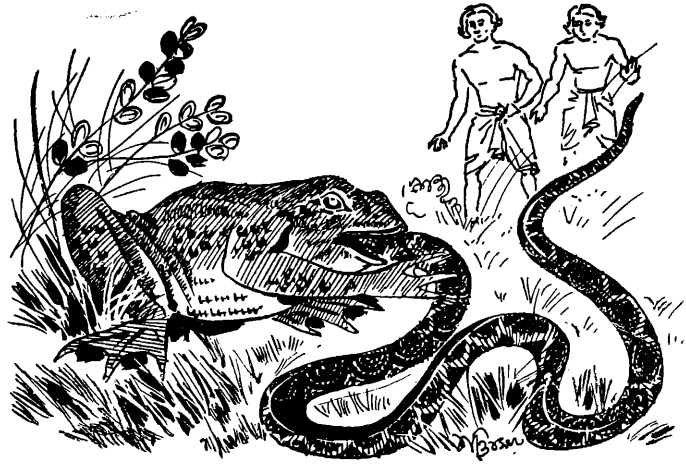

ব্যাঙটি সাপটির টুঁটি গিলে ফেললো।

সাপ খেকো ব্যাঙ

বগলা যোগশর্মা

সাপ ব্যাঙ খায় একথা সবাই জানো, কিন্তু ব্যাঙ সাপ খায় একথা কি কেউ শুনেছ? এই গল্পটি একজন সাঁওতালের মুখে শোনা। গল্পটি শোনো—

একদিন একদল সাঁওতাল তীর-ধনুক নিয়ে বনে শিকার করতে বেরিয়েছে। শিকার করতে করতে তারা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। শিকারের সন্ধানে এদিক ওদিক যখন ঘুরছে তখন তারা একটা বিরাটকায় সাপের হিস্-হিস্ শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায়। একটু লক্ষ্য করতেই দেখতে পায় সেই বিরাটকায় সাপটি গুরুগম্ভীর গতিতে এগিয়ে চলেছে একটি ব্যাঙকে তাক্ করে। ব্যাঙ যে সাপের প্রিয় খাদ্য। ব্যাঙটির চেহারাও বেশ লোভনীয়। সাধারণ ব্যাঙএর চাইতে বড়, মাথাটি বেশ বড় এবং লাল রঙের—মনে হয় কেউ যেন ব্যাঙটির মাথায় সিঁদুরের প্রলেপ দিয়েছে। ব্যাঙটি কিন্তু তার শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্যে একটুও চেষ্টা করলো না, বরং ড্যাব-ড্যাব করে বড় বড় দুটো চোখে মনের আনন্দে সাপটির দিকে তাকিয়েই আছে। কাণ্ড দেখে সাঁওতালগণ চুপটি করে দেখতে লাগলো শেষ পর্যন্ত কি হয়! সাপটি ব্যাঙের দিকে বিরাট ফণা তুলে এগিয়ে আসছিলো। ব্যাঙটির প্রায় কাছাকাছি আসতেই সাপটির সেই বিরাট ফণা আপনিই নত হয়ে এলো। কোথা থেকে কি যেন জাদুর কারসাজি হয়ে গেল। সাপটি নিস্তেজ হয়ে গেল। ব্যাঙটিকে আর ধরবার সাধ্যি রইলো না।

ব্যাঙটি এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়েই খপ

করে সাপটির টুঁটি গিলে ফেললো। যন্ত্রণায় সাপটি তখন ছটফট করতে লাগলো কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে আর ব্যাঙের হাত থেকে রেহাই পেল না। ধীরে ধীরে মনের আনন্দে সাপটিকে গিলতে আরম্ভ করলো।

ঘটনাটি শোনামাত্র একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল তাড়াতাড়ি একটা বস্তা নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলো। দেখলো যে ব্যাঙটির আহার সবেমাত্র শেষ হয়েছে। তাই না দেখে সেই বৃদ্ধ সাওতালটি ঐ ব্যাঙটিকে ধরার জন্যে একটা গাছের উপর চড়লো এবং ব্যাঙটিকে লক্ষ্য করে সেই বস্তাটি নীচে ছুড়ে ফেলে দিল কিন্তু ব্যাঙটিকে ধরা গেল না। বিরাট এক লাফে গভীর অরণ্যে ঢুকে গেল।

আদিবাসী সাঁওতালদের অনেকে বিশ্বাস করে ব্যাঙের মাথায় কোনও দিন যদি বজ্রপাত ঘটে তখন সেই ব্যাঙটি আর সাধারণ ব্যাঙ এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে না। ব্যাঙটি তখন রাক্ষুসে ব্যাঙের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। আর ঐ বজ্রপাতের ফলে তার মাথায় জন্মায় এক ধরনের চুম্বক। যাহা সাধারণ চুম্বকের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী। এইরূপ ব্যাঙ সাধারণতঃ চোখে পড়ে কম, কারণ এরা গভীর অরণ্যে বাস করে। এইরূপ ব্যাঙের মাথা থেকে চুম্বকটি যদি সংগ্রহ করে ঘরে রাখা যায় তাহলে কোনদিনই সেই ঘরে সাপের ভয় থাকে না।

———

কলিকাতার ধর্মতলা অঞ্চল হইতে শ্রীনীলা নন্দী তাঁহার স্বর্গগত পিসতুতো ভাই সুব্রত দাশগুপ্তের পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করিয়াছেন।

তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺সুব্রত দাশগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

মহাভারতের অলৌকিক কাহিনী

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩২শে জ্যৈষ্ঠ। প্রতিযোগতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী ভাদ্র সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার ১৫·০০ টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার ১০·০০ টাকা**

"৺সোমেশ স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

পারানা

শ্রীআনন্দকুমার বসু

কলম্বাস তখনও আমেরিকা আবিষ্কার করেননি, সেই সময়কার আমেরিকার ইতিহাস আমরা খুব কমই জানি। তবে প্রায় গোটা আমেরিকা জুড়ে তখন চলছিল ইনকাদের রাজত্ব। সেই সময় দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর ধারে আজকের মতই গভীর জঙ্গল ছিল, আর এই জঙ্গলের মধ্যে ছিল অসভ্য হিংস্র ইনকাদের রাজত্ব। সাধারণভাবে দলে দলে ভাগ হয়ে এক একটা অঞ্চল জুড়ে রাজত্ব করত। প্রত্যেক দলের এক একটা সর্দার থাকত। এইসব দলের যদিও আচার ব্যবহার অনেকটা একরকম ছিল, কিন্তু নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব একদম ছিল না। প্রায়ই শক্তির প্রতিযোগিতা চলত। শুধু তাই নয় দলের মধ্যেও ছিল হিংসা, বিদ্বেষ, আর তাই মুহূর্তের অসাবধানতায় ঝলসে উঠত ঘাতকের তলোয়ার।

এমনি এক ইনকা দলের সর্দার ছিল লাওপুলে। আমাজনের ধারে গভীর জঙ্গলে তার দলবল নিয়ে লাওপুলে বেশ ভালভাবেই রাজত্ব করত। লাওপুলের তিন বউ ছিল। বড় বউয়ের এক ছেলে মিরাজ, মেজ বউয়ের এক মেয়ে পারানা আর ছোট বউয়ের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। ছোট বউয়ের নাম মিনাতা। লাউপুলে একবার নদীর ওপারে যুদ্ধ করে জিতে এনে ছিল এই ছোট বউকে।

মিরাজের বয়স প্রায় কুড়ি, পারানার বয়স ষোল হবে। শক্তি আর সাহসে মিরাজের সমকক্ষ তখন দলের মধ্যে কেউই ছিল না। মিরাজ যখন ছোট ছিল, তখন থেকেই ভেলায় করে ছোট বোনকে নিয়ে আমাজানে মাছ শিকার করে বেড়াত। তার দাপটে জলের কুমীরও বোধহয় ভয় পেত। বনের হিংস্র জাগুয়ারাও মিরাজের নিশানার মধ্যে আসতে চাইতো না।

লাওপুলের ছোট বউ দেখতে সুন্দরী হলেও মনটা তার ছিল বনের ময়াল সাপের চেয়েও কুটিল। সে সর্বদা মনে মনে লাওপুলের ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু কি করে সে তার স্বামীর ক্ষতি করবে তার কোন পথ খুঁজে না পেয়ে ঠিক করলে, যখন তার স্বামী শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ভুলে উৎসবে মেতে উঠবে তখন নদীর ওপারে তার বাবাকে খবর দেবে আক্রমণ করার জন্যে।

সমস্যা হল কি করে খবরটা ওপারে পৌঁছে দেওয়া যায়। সাতার দিয়ে নদী পার হওয়ার সাহস বা শক্তি মিনাতার কোনটাই ছিল না। তখন সে একটা কৌশল করলে। বাঁশ কেটে কতকগুলি ছোট ছোট টুকরো করল। প্রত্যেক টুকরোটার দুদিকে পাট। ফলে টুকরোটা দুমুখ বন্ধ ফাঁপা নলের মত জলে ভাসত।

মিনাত সেই নলের এক মুখে ফুটো করে স্বামীর দলের সমস্ত গোপন সংবাদ লিখে নলে পুরে গর্তটা কাঠি দিয়ে বন্ধ করে জলে ভাসিয়ে দিতে লাগল।

তার মনে ছিল এই আশা যে একটা না একটা নল তার বাবার হাতে পড়বে।

এইভাবে কিছুদিন নল ভাসাবার পর হঠাৎ তার বাবার দলের একটা লোকের সঙ্গে মিনাতার এক জঙ্গলে দেখা হয়ে গেল। তার কাছ থেকে মিনাতা জানলে যে তার কৌশল সফল হয়েছে। বাবা নল পেয়ে চর পাঠিয়েছে। সেই চরের মারফৎ চক্রান্ত দানা বাঁধতে শুরু হল।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর মিনাতা জানতে পারলে তার স্বামী লাওপুলে এবার অবসর নিয়ে তার ছেলেকে সর্দার করে দিয়ে যাবে। কবে অভিষেক হবে খবর পেয়ে মিনাতা খবরট চরের মারফৎ বাবাকে পাঠিয়ে দিলে।

ঠিক হল অভিষেকের দিনই মিনাতার বাবা আক্রমণ করবে।

অভিষেকের দিন এসে গেল।

সেদিন পূর্ণিমা রাত। আমাজনের এপারে খোলা মাঠে জ্বলে উঠল অসংখ্য মশাল। চিরাচরিত প্রথায় লাওপুলে তার মাথায় পরা শকুনের পালকের মুকুটটা খুলে পরিয়ে দিল মিরাজের মস্তকে। অভিষিক্ত হয়ে মিরাজ একে একে সাতটা মোষ বলি দিল। হাঁড়িকাঠের চারপাশে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। তার দলের লোকেরা প্রচণ্ড উল্লাসে সেই মোষের দেহ আগুনে পোড়াতে শুরু করলে। ওটাই এই অনুষ্ঠানের প্রধান খাদ্য। এদিকে যখন উৎসব পুরোদমে চলেছে তখন নিঃশব্দে ওপার থেকে একটার পর একটা ভেলা এপারে এসে জমতে শুরু হল। ভেলায় ছিল অস্ত্রে সজ্জিত শত্রু ইনকা যোদ্ধার দল। ক্ষণকাল পরেই অভিষেকের পবিত্র ভূমি হয়ে উঠল যুদ্ধক্ষেত্র। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাজিত হয়ে বন্দী হল লাওপুলে ও মিরাজ। ওরা লাওপুলেকে নিয়ে হাঁড়িকাঠে ফেলার পরেই মুহূর্তের মধ্যে লাওপুলের কাটা মাথাটা গড়িয়ে পড়ল দেহ থেকে। এবার মিরাজের পালা, কিন্তু মিনাতা এক অদ্ভুত প্রস্তাব করল। সে মিরাজকে ছেড়ে দিতে পারে, যদি মিরাজ নিজে হাতে তার ছোট

বোনকে বলি দিতে পারে। কিন্তু এ কাজ মিরাজের কাছে অসম্ভব। নিজের চেয়েও বেশী সে ভালবাসে তার ছোট বোনকে আর তাকে সে দেবে নিজের হাতে বলি। না তার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা অনেক সোজা। সে চিৎকার করে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগে পারানা স্বেচ্ছায় এসে হাঁড়ি কাঠে শুয়ে পড়েছে।

"পারানা, এ হতে পারে না, বোন উঠে এস, আমি এ পারব না।" মিরাজ কেঁদে ওঠে।

"না মিরাজ, তোমাকে বাঁচতে হবে। তুমি না বাঁচলে পিতার আত্মা শান্তি পাবে না। তাই আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

মিরাজ হাতের তলোয়ার শূন্যে তুলল।

পারানার ইঙ্গিত বুঝতে একটুও দেরি হল না মিরাজের। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে তার বোনের সকাতর অনুরোধ মিরাজের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সে নিজেকে ভুলে যায়। ভাবে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারলে তার বাবা ও পারানার আত্মা তৃপ্ত হবে। তাই আর দ্বিধা না করে হাতের তলোয়ার শূন্যে তুলল। মুহূর্তের মধ্যে পারানার মাথাটা লুটিয়ে পড়ল দেহচ্যুত হয়ে মাটির উপর।

পারানা জানতো তাকে বধ করে মিরাজ নিজে বাঁচতে চাইবে না। তাই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার ইঙ্গিত করে সে ভাইকে শত্রুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে নিজে জীবন দিলে।

আমাজনের ধারে সেদিন নীল আকাশের নীচে ভ্রাতৃস্নেহের যে অতুলনীয় কীর্তি পারানা রেখে গেল, তা ইনকাদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ইনকা মায়েরা আজও সেই কথা তাদের ছেলেমেয়েদের গল্প করে বলে।

———

"৺সোমেশ স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

নবাবের ভ্রাতৃস্নেহ

শ্রীরেবতীকান্ত গোস্বামী

সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্কালে লক্ষ্ণৌর নবাব সাহাজাদ আলী মহাপরাক্রমশালী শাসনকর্তা ছিলেন। শৌর্যেবীর্যে তাঁর সমতুল্য সেই তল্লাটে আর কেউ ছিল না। যুদ্ধ পরিচালনাতেও তিনি ছিলেন দক্ষ। পাণ্ডিত্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম।

প্রজারা নবাবের ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁর সভাসদবর্গের মধ্যে অনেকে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। নবাবের সরলতার সুযোগ নিয়ে যারা তাঁকে প্রতারিত করবার চেষ্টা করেছে, তাদের নবাব কোনদিন ক্ষমা করেন নি। খাজনা আদায়ের খাতায় কারচুপি করার দায়ে এক নায়েবকে তিনি প্রকাশ্য রাজপথে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিলেন। সেই থেকে একদল কর্মচারী নবাবের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করছিলেন। নবাব সেই কথা জানতে পেরে তাঁদের অনেককে মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবার আদেশ দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে নারীজাতীকে তিনি মাতৃজাতিজ্ঞানে সম্মান দেখাতেন। মুসলমান ধর্মে বহুস্ত্রী রাখার নিয়ম প্রচলিত থাকলেও নবাব সেই নিয়মকে সমাজের কলঙ্ক বলেই মনে করতেন এবং বলতেন—নারীজাতি মায়ের প্রতিচ্ছবি সেইজন্য নারীকে কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। মানুষ একজনের বেশী কাউকে সমানভাবে ভালবাসতে পারে না। একাধিক স্ত্রী রাখলে কোন স্ত্রীর প্রতিই যথার্থ ব্যবহার করা যেতে পারে না। সেই কারণে তিনি নিজেও করেন নি এবং অপরে করেছে জানতে পারলে তাকে কখনই ক্ষমা করতেন না। আবার কেউ যদি কোনদিন নমাজ বা কোরান পাঠ না করতেন, জানতে পারলে তাকেও কঠোর শাস্তি দিতেন।

এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন নবাব সেইকালে বড় একটা দেখা যেতো না। নবাবদের বেশীভাগই ছিলেন ভোগবিলাসী ও আরামপ্রিয় এবং প্রজাদের প্রতি সুশাসন করতেন না।

নবাব সাহাজাদ আলী একদিন শিকারে যাবেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল নবাবের শিকার যাত্রার কথা। নবাবের শিকার-যাত্রা আজকালকার রাষ্ট্রনেতাদের দেশ-ভ্রমণের মত হতো। সেই যাত্রা-পথের মাঝে মাঝে তোরণ তৈরী হতো এবং প্রজারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নবাবকে সাদর অভ্যর্থনা করতো। সঙ্গে থাকতেন বেগম ও তাঁর পরিচারিকা কয়েকজনা।

এখনকার রাজা মহারাজেরা যেমন বিশ্রামের জন্য শৈলাবাসে কিংবা অন্য কোন বৃহৎ স্থানে যান, নবাবের সেই বিশ্রাম যাত্রাই ছিল শিকারের মাধ্যমে বনজঙ্গলের নিকটবর্তী কোনস্থানে। নবাবের শিকার ছিল পাখিশিকার; বন্যজন্তু নয়। বন্যজন্তুকে তিনি ভালবাসতেন।

নবাব বিষাক্ত রক্ত শোষণ করতে লাগলেন। [পৃষ্ঠা ২২৮

সবাই আশ্চর্য হয়ে যেতো—বাড়িতে একটি বাঘকে গৃহপালিত কুকুরের মত নবাবের পিছনে পিছনে বিচরণ করতে দেখে। অতি শিশুকাল থেকে নবাব সেই ব্যাঘ্র-ছানাকে লালন-পালন করে এবং শিক্ষা-দিক্ষ দিয়ে পোষা কুকুরের মত তাঁর কাছে কাছে রাখতেন।

হিংস্র ব্যাঘ্রকে যে আপন করতে পারে, তাঁর চরিত্রের মাধুর্য কতখানি উচ্চস্তরের তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়।

শিকারের স্থানে নবাব একদিন মহাভোজের আয়োজন করেছেন। মহাধুমধাম। মহা আয়োজন। নানারূপ আহারের আয়োজন হয়েছে।

নিমন্ত্রিত সকলেই আহারে বসতে যাবেন, এমন সময় নবাবকে গিয়ে একজন সংবাদ দিলেন যে তাঁর ছোট ভাই আমজাদ আলীকে সর্পে দংশন করেছে

লক্ষ্ণৌর অনতিদূরে একটি মহল্লায় ছোট-ভাই সস্ত্রীক বাস করতেন। সংবাদ পেয়েই কোনপ্রকার আহার বা পানীয় গ্রহণ না করেই যেরূপ অবস্থায় ছিলেন, ঠিক সেইরূপ বেশেই একাকী একটি অশ্বে আরোহণ করে সাধারণ নাগরিকের মত ছুটে এলেন ছোট ভাইয়ের কাছে। নবাবকে ঐরূপ অবস্থায় দেখে সেখানকার প্রায় সকলেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন তাঁর ভ্রাতৃস্নেহের মহিমা দেখে।

নবাব এসে দেখলেন—ভাইকে একটি পালঙ্কে শুইয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত শরীর সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে তার। তার চারিদিকে ডাক্তার বদ্যি ওঝার দল নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কিছু করতে পারলেন না।

অবশেষে নবাব পকেট থেকে একটি ছুরি বের করে দংশনের জায়গায় চিরে ফেললেন। তারপর সেই ক্ষতস্থানে নিজে মুখ দিয়ে তার বিষাক্ত রক্ত শোষণ করতে লাগলেন। সবাই নিষেধ করলেন। নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে কারো কথায় কোনরূপ কান না দিয়ে সজলনেত্রে নবাব একনিষ্ঠভাবে ছোট ভাইয়ের রক্ত চোষণ করতে করতে ভাইয়ের কাছেই ঢলে পড়লেন। উপস্থিত সবাই হায় হায় করতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল ছোট ভাই চক্ষু মেলে চাইলেন। যখন তার সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখলেন বড় ভাইকে নিয়ে সবাই চলেছে গোরস্থানে কবর দিতে আল্লা আল্লা বলতে বলতে।

বরাত

এক অখ্যাত গ্রামে কামারের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করে কেউ কি জীবনে বড় হবার কল্পনা করতে পারে। শুধু কি তাই? বাল্যকালেই মাতাপিতাকে হারিয়ে আত্মীয়দের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর যদি তাঁকে মানুষ হতে হয়, সে কি কখন বড় হতে পারে? কিন্তু পেরে-ছিলেন আমেরিকার একত্রিংশৎ প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভার। তিনি ১৯২৮ সালে আমে-রিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

গবেষণা চলছে

সাবান বা পরিষ্কারক আরকে অনেক সময়ে ময়লা ছাড়ে না। তাই বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে করতে অক্সি আর প্রাকৃতিক তৈলের সংমিশ্রণে একটা আরক তৈরি করেছেন যা চব্বিশ ঘণ্টায় সমস্ত ময়লা গলিয়ে দেয়।

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১। দোকান থেকে কিনে এনে
যত্ন করে রান্না করি
খাই না তাহা ফেলে দিই
কি সে জিনিস বলতে পারো? —অনিমেষ, শিখা পাল ও মলিনাদি, দমদম।

২। বলছি এখন মুণ্ডুহীন
মুণ্ডু চলো আনি,
মাছের মুণ্ডু আনলে পাবে
খাদ্য খাসা জানি। —পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা, ছড়রা, পুরুলিয়া।

৩। জাহাজের হিসাব তুমি চাও?
পক্ষীমাঝে সন্ধানটা নাও। —শ্যামাপ্রসাদ দাস, কয়াঘাট, হুগলী।

গত ফাল্গুন সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। হক ২। 'বাইশ' এখানে সংখ্যা নয়, একটি যন্ত্রের নাম।

৩।

১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	২	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	৩	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩
৩৪	৩৫	৩৬	৪	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯
৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৬	৫৫	৫৬	৫৭
৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৭	৬৪	৬৫
৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৮	৭৩
৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৯
১ম পুত্র	২য় পুত্র	৩য় পুত্র	৪র্থ পুত্র	৫ম পুত্র	৬ষ্ঠ পুত্র	৭ম পুত্র	৮ম পুত্র	৯ম পুত্র

আরও অন্যভাবে উত্তর হতে পারে।

গত ফাল্গুন সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা —রুনু, ঝিংকু মা ও বাবা—নারায়ণ রায় রোড; রবি রায় ও প্রশান্ত ভট্টাচার্য—দমদম রোড; রাণী, নচিকেতা ও অনিরুদ্ধ সাধু—পর্ণশ্রী পল্লী; অরুণ, অলোক, সীমা, অসীম ও অমিত দাস—বি. টি. রোড; বাবলী, কাকলী, সোনালী, মিঠু, তানা ও টুবলুন রাহা—পূর্বসিঁথি রোড; সমীরণ, সঙ্গীতা, সুকুমার, শিবানী, নরেশ ও রাখালরাজ—গরচা ফার্স্ট লেন; শুক্লা, শুভ্রা, অসীম, অমিত ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন; সোনালী রায় কবীর রোড; ভারতী, মণিকা ও সান্ত্বনা রায়চৌধুরী—বাসুদেবপুর মেন রোড; বাবু কমল, চন্দন, পঞ্চা ও দুর্গা—জ্যোতিষ রায় রোড; সজল মজুমদার ও দেবজ্যোতি মিত্র—রাজা দীনেন্দ্র

স্ট্রীট ; জয়দীপ ঘোষদস্তিদার—সিংহী বাগান ; নন্দদুলাল দাস ও শান্তিময় হাজারি—প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন ; শীলা ও কপিল দাস বিরাটী ; সোমা, শৈবাল, জুলি ও তুলতুলি—হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন ; দেবাশীষ, ইন্দ্রানী ও কস্তুরী মহলানবীশ—পঞ্চাননতলা রোড ; পিংলু, টুবলু, জেঠু, তোতন ও টুলটুল—পূর্ণ মিত্র লেন ; জয়দীপ, পিউ, নন্দন, বেলা ও অজিত মুখার্জী—জ্যোতিশ রায় রোড ; বিশ্বনন্দন, কবিতা, স্মৃতি ও ভাল দাস—গর্চা ফার্স্ট লেন ; সুভাষ, সুমিতা, মণিকা ও সুতনুকা সিংহ—লেক গার্ডেন্স্ ; কিংশুক জোয়ারদার—জপুর রোড ; শ্যামল দে —গিরিশ এভিনিউ।

চব্বিশ পরগনা—রঞ্জু, খুকু, সঞ্জু টিংকু, রিংকু মা ও বাবা—বারাসত ; তাপস, মদন, বিশা, দেবু ও প্রদীপ—পলতা ; নন্দিনী, বনানী, ইন্দ্রানী, গৌরী ও প্রবীর—বারাকপুর ; কৃষ্ণা ও বাবুল দত্ত—পূর্বপুটিয়ারী ; অসিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া ; চন্দ্রারানী, চিত্রারানী ও সবিতকুমার ঘোষ—সুবুদ্ধিপুর ; সৌমিত্রিশঙ্কর ও সুগতশঙ্কর উকিল—বারাকপুর ; বাবা, মা ও বুবুল—সোদপুর ; শান্তিময় ও অসিতবরণ পাল—কল্যানগর ; বিশ্বজিৎ ও চিরশ্রী ব্যানার্জী—ইছাপুর।

হাওড়া—শিতু, ফুটু, ভোলা, শিবান, কাকাব, রোদন জয়ন্ত, খুকু, বুনু প্রভৃতি—রামজী হাজরা লেন ; খোকা, সুশান্ত, মিঠু, তপতী ও অমরেশ—কাসুন্দিয়া রোড ; অশোক, ছোড়দা, তাপু, অরুণা প্রভৃতি—জগাছা ; খুকু, লিসা, ভাই, পাম্মুল, লালি ও বুড়কু—ইছাপুর রোড ; সুশান্ত, শম্পা, গোপা ও পম্পা গাঙ্গুলী—নরসিংহ দত্ত রোড ; বাপ্পা, রাণা লালী, মাম্মা, মাসীমা ও দিদিমা—হাওড়া-১ ; সুব্রত, সোনালী, কেকা, রূপা, শম্পা, দীপা ও ভাস্কর—রামরাজাতলা।

হুগলী—দীপক, দিলীপ, অনুরাধা, মা ও বাবা—শেওড়াফুলী ; মিলু নাণু, রীণা, রীতা, রমা, দাদু প্রভৃতি—কাঁঠালগড়িয়া ; কাঞ্চন ও শ্রী—ইটাচুনা

বর্ধমান—অলোক, মনোজ, সরোজ, শুভ্রা ও টুলটুল রায়—দুর্গাপুর ; মান্তু, বুড়ী, রেণু বেবী, মিঠু ও টিঙ্কু ষড়বেলুন ; জয়ন্ত, অশোক, শর্মিলা, সুকান্ত ও কৌশিক ঘোষ—আসানসোল ; কাজল, রবীন, গোরা মেজদা, বৌদি ও কল্পনা—দুর্গাপুর-৪ ; মা, বাবা, নীলাঞ্জন ও তথাগত মুখোপাধ্যায়—বর্ধমান : রামকৃষ্ণ, স্বর্ণলতা, উৎপল ও পুষ্পল বন্দ্যোপাধ্যায়—গোপীনাথবাটী ; শুক্লা, খোকন, বোটন, মুনমুন ও মিলন—দুর্গাপুর।

নদীয়া—সুস্মিতা ও সুদীপ্ত মাইতি—কল্যাণী।

মুর্শিদাবাদ—কান্দী বিদ্যার্থীভবনের ছাত্রবৃন্দ—কান্দী।

মেদিনীপুর—প্রতীপ, ফাল্গুনী, অতনু, কৃষ্ণা ও টুপটুপ—রাউতারাপুর ; কুমারিকা, ছলনা ও মৌসুমী—মেছেদা ; রাজারাম, নবদ্বীপ, নারায়ণ ও রঞ্জনা কুইলা—মেছেদা ; অমূল্য, দেবু, তুলসী, দুর্গাদাস, মেজদা প্রভৃতি—পাটনাবাজার ; স্বপ্না, অঞ্জন, সঞ্জয়, মা বাবা, অরুণকাকু—গড়বেতা।

বীরভূম—বাপী, মামণি, আশীষ, চঞ্চল, চন্দন ও কল্যাণ—আমোদপুর ; ভাগ্যধর হাজারী ও অঞ্জনা ঘোষ—সিউড়ী ; ডলি, ইউসুফ, আমারুল, ভাই ও সালসা—হাতিয়া ; সৌমিত্র, শিখা, অনুরাধা ও আশীষ ভৌমিক—দুবরাজপুর।

মালদহ—নন্দিনী, হীরক, সোনালী, বাবলু, মন্টা ও শুক্লা—মালদহ ; লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ—সাদীপুর।

বাঁকুড়া—গোপাল, ভক্তিরানী, প্রদীপ, দিলীপ, প্রতিমা ও অসীমা রায়—গেলিয়া।

পুরুলিয়া—কবিতা, কণিকা, কাজল, কল্লোল, কল্যাণ প্রভৃতি—আদ্রা।

বিহার—রেবা, বানী, ছন্দা, রত্না, রুমা এবং রীণা চক্রবর্তী—চিরকুণ্ডা ; ছন্দা, দীপু, অনু ও সমু—পাটনা-৪ ; সুলগ্না, সুস্নাতা ও অরূপ—রাঁচী ; শর্বরী, সর্বাণী, বিনীতা ও সুনীতা পাণ্ডে—বারিডি ; স্বপ্না, অপর্ণা, অনন্যা, শান্তনু, সৌম্য ও সৌরভ—জামসেদপুর-৪ ; ভাটা, লাল্টু, গৌতম, রেশমী ও সুপ্রতীম—ধানবাদ ; মৌসুমা সরখেল—জামসেদপুর-৪ ; অরুণ, ফটিক, নমিতা, অনিতা ও রেখা গড়াই—চিরকুণ্ডা ; বাবলা ও ফান্টুস বরাট—ধানবাদ ; বাবা, প্রশান্ত, কল্যাণী ও পার্থ—মাইথন ; মৃণাল গোস্বামী—মাইথন ; চিন্তা, পুতুল, তুতুল, বুবুল, টুবুল ও সনৎ—চিরকুণ্ডা ; মা, বাবা, সোমা ও শ্যামল গোস্বামী—চিরকুণ্ডা ; স্বপন, কবিতা, তরুণ, বাবা ও মা—হিনু ; চণ্ডী, বাবলু, শীলু, বুড়ি, উত্তম প্রভৃতি—সিজুয়া ; অরুণ, বরুণ, তরুণ এবং তাপস সরকার—ধানবাদ ; মা, বাবুজী ও মিশুংকা—৯৯ এ পি ও।

উড়িষ্যা—রীণা, রীতা, মিতা ও মদন—রাউরকেল্লা-২।

আসাম—অজয় বসু—লামডিং ; ইতু, ইমু, অলি, সুনন্দা ও পারুল—তেজপুর ; রুবলী, বাবলী, পান্না ও মুক্তা পুরকায়স্থ—কেহাং চা বাগান।

উত্তরপ্রদেশ—চঞ্চল, রুণা, টিটো, অঞ্জলী ও অমল মৈত্র—আর্যাপুর এস্টেট।

তোমরা যে যে এই দুটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারবে তাদের প্রত্যেককে পুরস্কার দেওয়া হবে 'এক যে ছিল বাঘ' ছবি দেখার তিনটি ফ্রী-টিকিট

১ বাচ্চাটা কেটলি করে বাঘকে কি খাওয়াচ্ছে?

২ বাচ্চাটা কীসের ওপর চেপেছে?

এক যে ছিল বাঘ

ক্যালকাটা প্রোডাকসন্সের ছবি

নিজের নাম-ঠিকানা পরিস্কার করে লিখে নীচের ঠিকানায় **২৩শে** এপ্রিলের মধ্যে উত্তর পাঠাবে

ঠিকানা :- বর্ণালী ফিল্মস, ৪৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

তোমাদের উত্তরের সঙ্গে তিরিশটি বাক্যের মধ্যে লিখে জানাও সিংহের বদলে বাঘকে জাতীয় পশু করা হল কেন।

বলুন তো এদের মধ্যে কার মা ইনক্রিমিন* খেতে দেন?

ঠিক ধরেছেন!

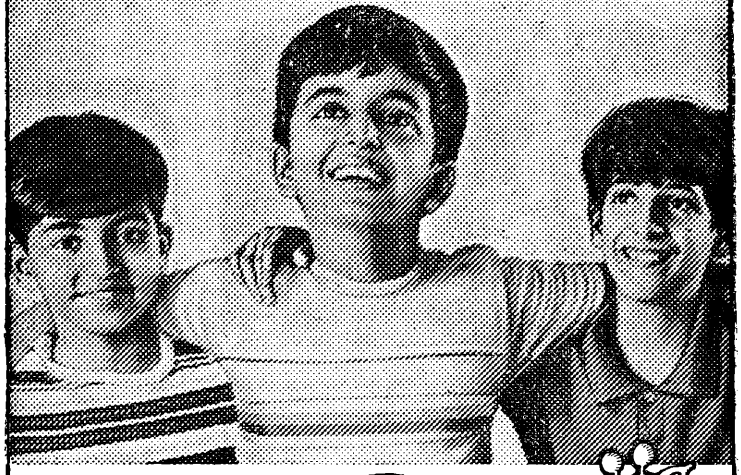

ড্রপ্‌স—২ মাস থেকে ২ বছরের শিশুদের জন্যে
সিরাপ—১৪ বছর অবধি বয়েসের বাচ্চাদের জন্যে

বড়ো হওয়ার বড়ো সহায়!
এই তো বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে সেরা টনিক!

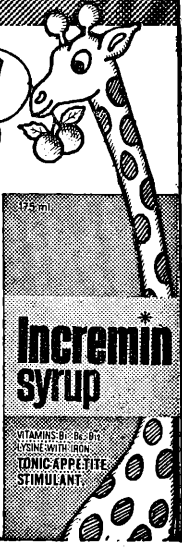

ইনক্রিমিন* টনিক

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে।

ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Lederle

সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ

* আমেরিকান সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

ISTA'S/INC/959 BEN

এই চায়ের জনপ্রিয়তা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে আপনাদের চাহিদাতেই

লিপটনের রুবি ডাস্ট

লিপটনের রুবি ডাস্ট চা রাতারাতি লোকের মন জয় করলো কেমন করে— বলুন তো? এর মূলে কিন্তু আপনারাই! কেননা, আপনারা চান এমন চা— যার প্রতি প্যাকেটে পাওয়া যাবে ঢের বেশি কাপ চা, গাঢ় লিকার আর মনমাতানো স্বাদগন্ধ।

লিপটন বলতেই ভালো চা
LIPTON

একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদেগন্ধে ভরপুর

প্রতি প্যাকেটে পাবেন ঢের বেশি কাপ চা
তাই এর কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে

LRDC-8/73 BEN

মুর্শিদ জাহানকোষা আজ অতীতের স্মৃতি

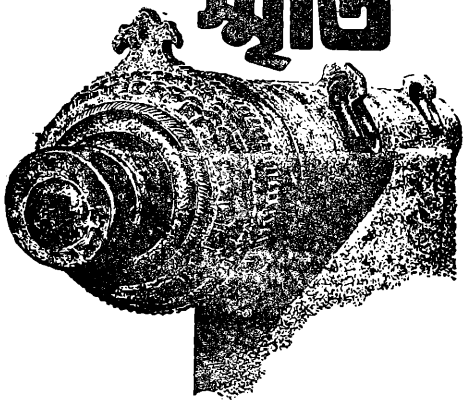

জাহানকোষা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সেরা হাতিয়ার। আজ অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র। অতীতের মুর্শিদাবাদ—ঐশ্বর্য আর বিলাসের লীলাভূমি। যেখানে অতুলনীয় দেশপ্রেম আর ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে সমান গতিতে। এখানে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র স্মৃতিসৌধ, যা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে নবাবী বাঙলার গৌরব-গাঁথা আর তার পতনের বেদনাময় ইতিহাস। এছাড়াও আজকের মুর্শিদাবাদে আপনি পাবেন অতীত ঐতিহ্যের স্মারক সূক্ষ্ম কারুকার্যে অসাধারণ হাতির দাঁতের জিনিস পত্র আর সিল্কের শাড়ি। আজই চলুন মুর্শিদাবাদ। দেখে নিন নবাবী আমলের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি। রাত্রিবাসের জন্যে রয়েছে বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজ। সেখানে পাবেন আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম।

বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈষ্ট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭১, গ্রাম : TRAVELTIPS
স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সর্বজন প্রশংসিত এবং বহুল প্রচারিত

সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

সরল বাঙ্গালা অভিধান মূল্য ২৫·০০

ডাকমাসুল সহ টা. ৩০·০০ স্থলে টা. ২৫·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Century Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 12·00

Century Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 12·00

ডাকমাসুল সহ টা. ১৫·০০ স্থলে মাত্র টা. ১২·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Pocket Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 6·50

Pocket Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 6·50

ডাকমাসুল সহ টা. ৮·০০ স্থলে মাত্র টা. ৭·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

NEW BENGAL PRESS (Private) Ltd., 68, College Street, Calcutta-12

॥ কিশোর কিশোরীদের কয়েকখানি ভালো বই ॥

শ্রীসুধীন রাহার
পাথরের পদ্মফুল— ১·৫০
[গুপ্তধনের জটিল রহস্য গল্প]

শচীন মজুমদারের
পথের বন্ধু— ১·২৫
[কানপুরের উকিল তারাপদ রায়ের পুত্র সঞ্জীব রায়ের অসীম বীরত্ব কাহিনী]

শ্রীঅখিল নিয়োগীর
ঘূর্ণিপাকে— ১·২৫
[বাঙ্গালী বালকের অদ্ভুত কৃতিত্ব। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র তিনটি বালকের পদব্রজে গঙ্গার উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার]

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মৃত্যুপথের যাত্রী— ১·৫০
[দস্যু সম্রাট তেজশঙ্করের অদ্ভুত দস্যু কাহিনী]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষের
অন্ধকূপের বন্দী— ১·৫০
দস্যু সর্দার রক্তরাওয়ের দুর্ধর্ষ দস্যুতার কাহিনী]

শ্রীনির্মলকুমার রায়ের
একটি ছেলের কাহিনী—২·০০
[বাঙ্গালীর ছেলে অজয়ের দুঃসাহসিক এ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী]

সুনির্মল বসুর
মন ছোটে মোর তেপান্তরে— ১·২৫
[ছোটদের রূপকথার গল্প]

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
নূতন আলো— ১·২৫
[দুই বন্ধু, তাঁদের ছাত্রজীবনের কীর্ত্তি কাহিনী]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
বিভীষিকার মুখে— ১·০০
[জঙ্গলে মানুষের সাথে বন্যজন্তুর লড়াই-এর লোমহর্ষক কাহিনী]

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদারের
হারানো দিন— ১·৫০
[দস্যি ছেলে অশোকের অলৌকিক কীর্ত্তি কাহিনী]

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদারের
বোম্বেটে দ্বীপ— ১·২৫
[সমুদ্রের বুকে জংলীদের পৈশাচিক হত্যালীলার কাহিনী]

সুনির্মল বসু ও পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অপরূপ কথা—১·২৫
[ছোটদের রূপকথার বই]

দেব সাহিত্য কুটীর—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

শিশু উপন্যাস

নূতন আলো
পরেশ সেনগুপ্ত
মূল্য—১·০০

ছোটদের গল্প
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
মূল্য—১·০০

লব-কুশ
আরতি ঘোষ
মূল্য—১·০০

সোনার কবচ
বঙ্কিম সেন
মূল্য—১·০০

পরাজিত এডারেষ্ট
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
মূল্য—১·২৫

ঘূর্ণিপাকে
অখিল নিয়োগী (স্বপনকুমার)
মূল্য—১·২৫

অপরূপ কথা
সুনির্ম্মল বসু
মূল্য—১·২৫

বোমার ভয়ে বার্মা ত্যাগ
মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
মূল্য—১·২৫

হারানো দিন
শচীন মজুমদার
মূল্য—১·২৫

পূজার মেলা
যামিনী সোম
মূল্য—১·২৫

অ্যাড্‌ভেঞ্চার ও রোমাঞ্চকর গল্প

প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ
হেমেন্দ্রকুমার রায়
মূল্য—১·২৫

বাহাদুর
যজ্ঞেশ্বর রায়
মূল্য—১·২৫

দেশ বিদেশের হীরে জহরৎ
খগেন্দ্রনাথ মিত্র
মূল্য—১·২৫

চম্বলের দস্যু সর্দার
উমাশঙ্কর হালদার
মূল্য—১·৫০

প্রলয়ের পর
সুবোধচন্দ্র মজুমদার
মূল্য—১·২৫

অজানা দেশে
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মূল্য—১·৫০

৪১ খানি পূজা বার্ষিকী

প্রত্যেকখানি চার টাকা

ছোটদের চয়নিকা ঝলমল
ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন
আজব বই শিশু-গল্পিকা
সোনার কাঠি
যাদুঘর চিত্রদীপ মায়ামুকুর
সোনালী ফসল
মধুমালা রূপরেখা বর্ষমঙ্গল
আলপনা রাঙারাখী
নবারুণ অঞ্জলি
আবাহন উদয়ন
অভিষেক পরশমণি
বসুধারা ইন্দ্রধনু দেবালয়
জয়যাত্রা নব পত্রিকা
ছোটদের মাধুকরী

প্রত্যেকখানি পাঁচ টাকা

অপরাজিতা দেব দেউল
অপরূপা শারদীয়া শ্যামলী
অলকনন্দা উত্তরায়ণ

প্রত্যেকখানি ছয় টাকা

নীহারিকা অরুণাচল
বেণুবীণা ইন্দ্রনীল শুকসারী

মণিহার ··· ৮·০০
উদ্বোধন ··· ৮·০০

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯
অসংখ্য বই চিঠি লিখলে বিনা মূল্যে পুস্তক-তালিকা পাঠান হয়। B—4